SANKHYA PHILOSOPHY.

TOGETHER WITH

EPITOME OF HINDU PHILOSOPHY IN GENERAL.

PART I.

PRINCIPLES OF COGNITION.

BY

KALIVARA VEDANTABAGISA.
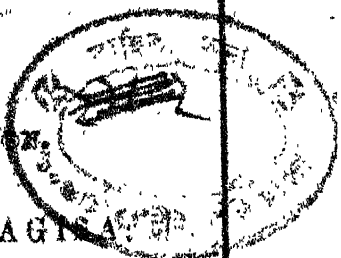
সাঙ্খ্যদর্শন।

অন্যান্য দর্শনের মত সম্বলিত।

পরীক্ষাকাণ্ড।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

[[illegible] ।
[illegible]]।

ROY PRESS,

(17, Bhowanee Churn Dutt's Lane, Calcutta.)

PRINTED BY BABOORAM SIRCAR

AND

PUBLISHED BY THE AUTHOR.

1877.

মূল্য ১॥০ এক টাকা আট আনা।

SANKHYA PHILOSOPHY

TOGETHER WITH

AN EPITOME OF HINDU PHILOSOPHY IN GENERAL.

PART I.

PRINCIPLES OF COGNITION

BY

KALIVARA VEDANTABAGISA:

অন্যান্য দর্শনের মত সম্বলিত।

পরীক্ষাকাণ্ড।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত।

[भग्नपृष्ठकटिग्रीव-गुप्तामस्तिष्कतालुना ।

कृतमित्येव रमते जनः साधुरसाध्वपि]।

ROY PRESS,

(17, *Bhowanee Churn Dutt's Lane, Calcutta.*)

PRINTED BY BABOORAM SIRCAR

AND

PUBLISHED BY THE AUTHOR.
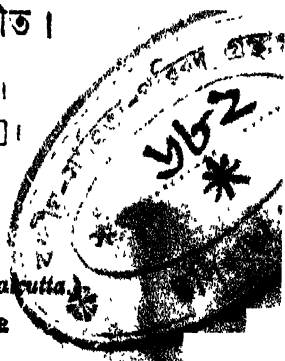
1877.

কৃতজ্ঞতা ও বিজ্ঞাপন।

স্বপ্ন-প্রয়াণ ও তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদীয়-ছাত্র এবং চিরপ্রতিপালক বহরমপুর নিবাসী পুরাতত্ত্ব লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু, শ্রীরামপুর নিবাসী এম্‌, এ উপাধি ধারী শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি এল্‌ উপাধি প্রাপ্ত কলিকাতা জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহাত্মা গণের ইচ্ছা এই যে, দেশীয় লোকের দ্বারা দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের অন্তর্মর্ম্ম সকল নিষ্কাশিত হইয়া ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় আনীত হইতে আরম্ভ হইলে বড় আনন্দের বিষয় হয়। বিশেষতঃ রামদাস বাবুর সাহায্যে আমি যখন অধ্যয়ন করি, তখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছা যে, আমি কোন দার্শনিক প্রস্তাব লিখি। উল্লিখিত মহাত্মাগণ এবং আত্মীয় বর্গের তাদৃশ ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া রাজর্ষিতুল্য বহুমানাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তথা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের যত্নে ও অনুগ্রহে আমি 'সাঙ্খ্যদর্শন' শীর্ষক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ইহার অধিকাংশই ক্রমপ্রকাশ্য রূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই সকল প্রস্তাব সঙ্কলিত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম।

এক্ষণে অধ্যেতা ও অধ্যাপক গণের নিকট আমার বিনয় প্রার্থনা এই যে, দুরবগাহ দর্শনশাস্ত্রে হস্তক্ষেপ করা মাদৃশ অল্পজ্ঞ চপলমতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত জানিয়াও আমি যে আপনাদের নিকট এই চাপল্য প্রকাশ করিলাম, আমার এ অপরাধ আপনারা নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। অপর নিবেদন এই যে, ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জ্ঞাপন করিবেন। তাহা হইলে আমি আপনাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারিব এবং ভবিষ্যতে যদি ইহার ভাগ্যে পুনর্মুদ্রণ থাকে—তবে সে সম্বন্ধে তাহা আমি অনায়াসে পরিহার করিতে পারিব। ইত্যলম্‌।

শ্রীকালীবর শর্ম্মা।

পুঁড়া, বশীর হাট।

সূচি-পত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠ হইতে	পৃষ্ঠপর্য্যন্ত।
গ্রন্থানুবন্ধ ও পূর্ব্বাভাস	/০	১।০
দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ...	১	১২
সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য	১২	১৬
জ্ঞান-নির্ব্বাচন এবং তৎসম্বন্ধে বিবিধ মত ...	১৭	১৯
প্রমাণ নির্ণয়	১৯	২০
চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ	২১	৩২
অধ্যাস বা ভ্রমজ্ঞান	৩২	৩৫
ভ্রমোৎপত্তির কারণ	৩৫	৩৯
ভ্রম-নিবারণের উপায়...	৩৯	৪১
শ্রবণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়	৪১	৪৭
স্পর্শ ও ত্বগিন্দ্রিয়	৪৭	৪৯
রস জ্ঞান ও রসনা	৪৯	
ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধ-জ্ঞান	৪৯	৫০
কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব	৫০	৫৭
যুক্তি ও যৌক্তিকজ্ঞান	৫৭	৭৪
যুক্তির অবয়ব ও তাহার শ্রেণীকল্পনা ...	৭৪	৭৮
ঔপদেশিকজ্ঞান ও উপদেশ	৭৮	৮২
আপ্তবাক্য	৮২	৮৬
বেদের পৌরুষেয়ত্ব শঙ্কা	৮৬	৮৮
শাস্ত্রের সত্যোদ্ধার-প্রণালী ও বিচারিত-বাক্যের শক্তি	৮৮	১০২
সৎকার্য্যবাদ ও প্রমাণকাণ্ড-সমাপ্তি ...	১০২	১১২

গ্রন্থানুবন্ধ।

(পূর্ব্বাভাষ)
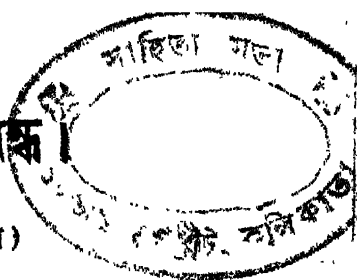
বঙ্গভাষায় বিচারগ্রন্থের অবতরণ করিবার সময় অদ্যাপি আগত হয় নাই। হেতু, বর্ত্তমান বঙ্গভাষার আয়তন অতি অল্প। যদিও বর্ত্তমান বঙ্গভাষা পূর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টি লাভ করিয়াছে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা কেবল দুই চারিটি রমণীমূর্ত্তি বা দু-পাঁচটি লতা গুল্ম চিত্রিত হইতে পারে, রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান ভাগও অনূদিত হইতে পারে; তদ্ভিন্ন, কোন দার্শনিকভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত করিয়া হৃদপ্রবিষ্ট করান যাইতে পারে না। কেন না, দার্শনিকভাব হৃদ্‌গত করিবার একমাত্র উপায় বিচার। (যাহাকে আমরা যুক্তি, তর্ক, উহ প্রভৃতি বহুনামে ব্যবহার করিয়া থাকি)। সেই বিচার নির্ম্মাণের উপ-যুক্ত উপকরণ (শব্দরাশি) বাঙ্গালা ভাষায় কৈ?—যদিও থাকে, বা না থাকিলেও ভাষান্তর হইতে প্রয়োজনানুরূপ সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতেপারে,—তথাপি সেরূপ করিয়া বিচার নির্ম্মাণ করিবার ব্যক্তি কৈ?—যদিও কোন কুশলী পুরুষ বিচার নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হন,(হইলেই বা কি হইবে?)—দেখা যায়,বিচার নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়া, অনেক লোকই কিছু দিন না কিছু দিন পরে নিবৃত্ত হন। নির্ম্মাতাদিগের কার্য্যোদ্যম স্থায়ী না হইলে কি তদ্দ্বারা ফল লাভের আশা করা যায়?—তাঁহাদের উদ্যম ভঙ্গের অনেকবিধ হেতু আছে। তন্মধ্যে প্রধানতম হেতু এই যে, বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ গ্রন্থের ব্যবহর্ত্তা ও

তাদৃশ গ্রন্থের আদরকর্ত্তা লোক অতি অল্প। একথা সত্য কি মিথ্যা, দেখ,—এ যাবৎ ন্যায়-পদার্থতত্ত্ব, তত্ত্ব বিদ্যা ও ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রভৃতি কএকখানি উত্তম বিচার গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা ক-টি লোকে ব্যবহার করে? ক-টি লোকেই বা আদর করে?—অনাদরের কারণ আর কিছুই না, কেবল,তাদৃশ গ্রন্থে লোকের রুচি না থাকাই কারণ। রুচি না থাকার কারণ বিবিধ। তন্মধ্যে তজ্জাতীয় গ্রন্থ না বুঝিতে পারাও এক-টি কারণ। এইটিই মুখ্য কারণ। না বুঝিবার কারণ কি?—প্রতিবন্ধক। কি প্রতিবন্ধক?—অপ্রাপ্ত ব্যবহার শিশুদিগের ব্যাকরণ সূত্র বুঝিবার যে প্রতিবন্ধক, বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ লোকেরই দার্শনিক পদ পদার্থ বুঝিবার সেই প্রতিবন্ধক। বালকেরা বৈয়াকরণিক পদার্থের চর্চ্চা করে না; সেইজন্য তাহা তাহারা হঠাৎ বুঝিতে পারে না; তদ্রূপ, বর্ত্তমান কালিক লোকেরাও চর্চ্চা করেন না বলিয়া দার্শনিক গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। অচর্চ্চিত পদ-পদার্থ সহসা উপস্থিত হইলে জ্ঞান তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। জ্ঞানগম্য না হইলেও বস্তুর যথাযথ আদর হয় না। অতএব, একদেশীয় ব্যবহার্য্য ভাষাদি, চর্চ্চা রহিত অন্যদেশীয়দিগের নিকট যেমন বিরক্তি ও উপেক্ষার সামগ্রী,—সেইরূপ, চর্চ্চাবিহীন বর্ত্তমানকালিক অধিকাংশ লোকের নিকট দার্শনিকভাব বিরক্তি ও উপেক্ষার সামগ্রী হইয়া আছে। যে মনুষ্যের যে বস্তুতে অরুচি থাকে, সে যদি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া সেই বস্তুর চর্চ্চা বা সেবা করে—তাহা হইলে তাহার সেই চর্চ্চা, তদ্গত অরুচির কারণ ধ্বংস করিয়া তদ্বিষয়ে অপূর্ব্ব রুচি উৎপাদন করে। এইরূপ চর্চ্চা-প্রবণতা মানব মনের স্বাভাবিক ও অব্যভিচারী ধর্ম্ম। মহর্ষি ব্যাস একস্থানে বলিয়াছেন,—

"स्यात् कृष्णनाम चरितादि सितापविद्या-
पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकैव ।
किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेवयैव;
स्वाद्वी पुनर्भवति तद्गद मूल हन्त्री ॥"

মর্ম্মার্থ এই যে, পিত্ত দুষ্ট হইলে জিহ্বায় সিতা অর্থাৎ চিনিও ভাল লাগে না। তিক্ত লাগে। কিন্তু, যদি আদর পূর্ব্বক ঔষধ সেবনের ন্যায় প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া তাহার সেবা (ভক্ষণ) করা যায়, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা সেই পিত্তদোষ নিবারিত হইয়া ক্রমে তাহাতেই রুচি জন্মে এবং তখন তাহার যথাবৎ স্বাদুতা অনুভূত হয়। এইরূপ, অপবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান বা মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তির ঈশ্বরধ্যান ভাল লাগে না, কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য যদি (ভাল না লাগিলেও) যত্নপূর্ব্বক কিছু কিছু করিয়া প্রতিদিন তাঁহার সেবা করে, তাহা হইলে সেই ভাল না লাগার কারণ অজ্ঞান বা মায়ামোহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়া ক্রমে তাহার মনে ঈশ্বর ধ্যানের স্বাদুতা অনুভব হয়।

অপিচ, শৈশব কালে আমরা কি জানিতাম;—আর এখনই বা আমরা কি জানি;—শিশুকালে আমাদের কি ভাল লাগিত,—আর এখনই বা কি ভাল লাগে;—অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, আমরা অনেক বিষয়ে শিশুকালে যাহা জানিতাম না—এখন তাহা জানি; শিশুকালে যাহা তিক্ত বোধ হইত—এখন তাহাই মিষ্ট বোধ হয়; শিশুকালে যাহা দুঃখকর ও বিরক্তিকর ছিল—তাহাই এখন সুখকর। এরূপ রুচি পরিবর্ত্তের কারণ আর কিছুই না, কেবল চর্চ্চা। সংসারচক্রের মহিমা, লোকযাত্রা নির্ব্বাহের অবশ্যম্ভাব বা আবশ্যকতা, সংসর্গ ও কালের পরিবর্ত্তন সহকারে তত্তৎ বিষয়ের

চর্চ্চা সাংসারিক লোকের আপনা হইতেই ঘটিয়া উঠে। অতএব, মনুষ্য যে যে বিষয়ের সাদর চর্চ্চা করিবে, কিছুকাল পরে চর্চ্চাপ্রবণ মন, সেই সেই বিষয়েই আমোদ পাইবে। মনের যদি এরূপ চর্চ্চা প্রবণতা-গুণ না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসার একরূপই থাকিত, নানা সম্প্রদায়ে কদাচ বিভক্ত হইত না। এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ্ কাল্ যেমন কাব্য, নাটক ও ইতিহাসাদির চর্চ্চা নিবন্ধন তজ্জাতীয় গ্রন্থপাঠে রুচি বা চিত্তপ্রাবণ্য দৃষ্ট হইতেছে; এইরূপ, জ্ঞান-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলেও কালে তাঁহাদের তাহাতেই রুচি বা চিত্তপ্রাবণ্য জন্মিতে পারে। চর্চ্চা ও কাব্যরুচিতার প্রভাবে তাঁহারা যেমন কাব্য পাঠে প্রভূত আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছেন—চর্চ্চা করিলে তর্কশাস্ত্রেও সেই রূপ আমোদ লাভ করিতে পারেন। যদি বল, বিচারশাস্ত্র অত্যন্ত কঠিন, বড় নীরস, সহজে বুঝা যায় না, তন্নিবন্ধন তাহাতে আমোদও পাওয়া যায় না; সুতরাং আমরা জ্ঞানচর্চ্চায় বিরত আছি। এই আপত্তির উত্তর এই যে, চর্চ্চা কর। চর্চ্চা করিলে পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্ত অনুসারে তোমাদের বৈচারিক ভাব, ভঙ্গী, শব্দপরিপাটী সমস্তই আয়ত্ত হইবে। তখন আর সে কঠিন, সেই না বুঝা, কিছুই থাকিবে না। এখন যে তোমরা কাব্য ইতিহাসাদির ভাব ভঙ্গী ও শব্দপরিপাটী প্রভৃতি সহজাত শক্তির ন্যায় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতেছ—এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি কি তোমাদের সহজাত শক্তি? কদাপি নহে। এ শক্তিও তোমাদের চর্চ্চা বা অভ্যাস দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছে জানিবে।

আর এক কথা। জ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চা ব্যতিরেকে মানব-মনের মলাংশ অপগত হয় না। বাক্ সৌষ্ঠবও জন্মে না। শিশু দিগের তুল্য সমুগ্ধ জ্ঞান ও অস্ফুটবক্তৃত্ব চিরকালই থাকে। যদি বল, তাহাতে

ক্ষতি কি? বিলক্ষণ ক্ষতি আছে। সম্মুগ্ধজ্ঞান ও বাক্-বিশুদ্ধির অভাব শিশুদিগেরই শোভা পায়, পরিণতবয়স্কদিগের নহে। পরিণত বয়স্কদিগের সম্মুগ্ধজ্ঞান ও অপরিস্কৃত বাক্য থাকা যে, ক্ষতি ও বিরক্তির বিষয় তাহা বলা বাহুল্য।

অপিচ, ভাষার অধিকার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বিচার গ্রন্থের বহু প্রচলন হইতে পারে না। বিচার গ্রন্থের ব্যবহার-প্রাচুর্য্য ব্যতিরেকে জ্ঞান চর্চ্চার আধিক্য জন্মিতে পারে না। জ্ঞান চর্চ্চার আধিক্য না হইলেও সম্মুগ্ধজ্ঞান ও বাক্ বিশুদ্ধির অভাব মনুষ্য-সমাজকে পরিত্যাগ করে না। এতদ্দৃষ্টে, বর্ত্তমান বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অনেকেরই মত এই যে, যাবৎ না বঙ্গভাষার অবয়ব বৃদ্ধি হয়—যাবৎ না বিচার গ্রন্থের বহুল প্রচার হয়—যাবৎ না দেশীয় দিগের মন বিচার দর্শনে উন্মুখ হয়,—তাবৎ, বঙ্গভাষার দ্বারা কোন প্রকার আত্মোৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার কাব্যরুচি এবং এক্ষণকার কাব্য, আর্ষ কালের কাব্যরুচি এবং আর্ষকালের কাব্যের ন্যায় নহে। পূর্ব্ব কালের লোকেরা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সংযুক্ত কাব্যই ভাল বাসিত। তৎকালের কাব্য লেখকেরাও তদনুরূপ কাব্য লিখিতেন। এক্ষণকার কাব্য ও কাব্যরুচি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; সুতরাং বর্ত্তমান পদ্ধতির কাব্য শ্রেণী আশাতীত উন্নত হইলেও তদ্দ্বারা ঔৎকর্ষ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। কাব্যরুচিতা একে ত তরল মনের কার্য্য; তাহাতে আবার তাহা গাম্ভীর্য্যের বিনাশক এবং অন্তস্তত্ত্ব দর্শনের প্রতিরোধক। এই সকল দোষ কাব্য সাধারণের। অপকৃষ্ট রসোদ্দীপক কাব্য এতদপেক্ষাও দূষণাবহ। অপকৃষ্ট কাব্যরসে আর্দ্র হইলে মন জড়তা প্রাপ্ত হয় ও ক্ষুদ্র হয়। স্বচ্ছতা, প্রকাশ শক্তি, ধারণা শক্তি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য

ও শান্তিপ্রভৃতি মানবমনের যে কিছু সদ্‌গুণ, সকলই বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্য মনুষ্যের স্তর্য বৃত্তিকে (কাম বৃত্তিকে) বেগিত করে। স্তর্য বৃত্তি যেমন মনুষ্যকে বেগে আক্রমণ করে, অন্য বৃত্তি সেরূপ নহে। স্তর্য বৃত্তির বেগ, যখন মানব হৃদয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার দৃশ্য হয় কামিনী, আর ধ্যেয় হয় কামিনীর মূর্ত্তি। তৎকালে তাহার মন কেবল সেই রমণী মূর্ত্তিতেই বিলাস করিতে থাকে। সে তখন জগতের অন্য কিছুই দেখিতে পায় না। কি আক্ষেপের বিষয়! যে মন ঐ বিপুল গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-বিরাজিত অনন্ত আকাশ—আর এই সকাননা সভূধরা সাগরান্তা পৃথিবী,—যুগপৎ এতদুভয়কেই আক্রম করিতে সমর্থ,—মনুষ্য সেই মন'কে কি না একটা ক্ষুদ্রায়তন নারী দেহে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে! কি আশ্চর্য্য! ঐ অবস্থাকেও আবার কেহ কেহ সুখের অবস্থা মনে করেন, বর্ণনাও করেন; পরন্তু তাঁহারা একবারও অনুধাবন করেন না যে, তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন করিতে পারিলে মন কত উন্নত হয় ও কত সুখী হয়। একন কি, একটা সামান্য কীটের বা ধূলিকণার তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্য ঈশ্বরের সন্নিধি লাভ করিতে পারে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজন কাব্য জিজ্ঞাসু, আর একজন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, এতদুভয়ের মধ্যে যে কি তরতম ভাব আছে, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন, যিনি একবার উভয় জিজ্ঞাসার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন। কাব্যবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা এতদুভয়ের ফল-তারতম্যের প্রতি নিপুণ হইয়া দৃষ্টিচালনা করিলে, কাব্যের আলোচনা রহিত করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি হইবে। পরন্তু আমরা সেরূপ করিতে বলিনা। আমাদের মত এই যে প্রমাণ-

নোদনের অবলম্বনস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ সৎকাব্য আলোচনা কর, আর তত্ত্বচিন্তা বহুপরিমাণে কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরাও কাব্যশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্রের পরস্পর বাধ্য-বাধক ভাব নির্দ্দেশ করত এই কথাই বলিয়াছেন। যথা,———

"काव्येन हन्यते शास्त्रं काव्यं गीतेन हन्यते।
गीतन्तु स्त्रीविलासेन स्त्रीविलासो बुभुक्षया॥"

কাব্য জ্ঞানশাস্ত্রকে বিনাশ করে। আবার কাব্যকে বিনাশ করে গীত। গীতকে বিনষ্ট করে স্ত্রীবিলাস, স্ত্রীবিলাসকে দূর করে বুভুক্ষা।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ কবি শিহ্লণ-মিশ্রও অপকৃষ্টরসোদ্দীপক কাব্য রচয়িতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,—

"यदा प्रकृत्यैव जनस्य रागिणः स्वतः प्रदीप्तो हृदि मन्मथानलः।
तदात्र भूयः किमनर्थपण्डितैः कुकाव्यहव्याहुतयो निवेशिताः!"

শিহ্লণ কবি শৃঙ্গার-রসের কবিতালেখকদিগকে অনর্থ-পণ্ডিত বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, কামাগ্নি, মনুষ্য হৃদয়ে স্বভাবতঃই প্রজ্বলিত, তাহাতে আবার অনর্থ-পণ্ডিতেরা নিরন্তর কু-কাব্যরূপ ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ করিতেছে, ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয়!!

এইরূপ, দার্শনিক পণ্ডিতেরাও কামিনীজিজ্ঞাসাকে জ্ঞানের বিশেষ প্রতিবন্ধক বলিয়া জানেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই বলেন "कामिनी जिज्ञासा स्वतः प्रतिबन्धिका"—অতএব, কেবল কামিনী ধ্যানের উদ্দীপক কাব্যের উন্নতি দেখিয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে,—অন্তস্তত্ত্ব প্রভৃতি তাত্ত্বিক ভাব ও তৎপ্রকাশোপযোগী ভাষা, এতদুভয়েরই বহু আন্দোলন করা উচিত।

যদি বল, "কাব্য কারেরা যে কেবল রমণী মূর্ত্তিই চিত্রিত করেন, আর আমরা যে কেবল তাহাতেই ডুবু ডুবু হইয়া থাকি এমত নহে। তাঁহারা কত শত নদ, নদী, সাগর, শৈল, বন, উপবন, তড়াগ, মরুভূমি, শ্মশানভূমি, যুদ্ধভূমি, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া আমাদিগের চিত্তকে হর্ষ, শোক, আবেগ প্রভৃতি বহুবিধ ভাবে পরিপূরিত করেন,—তদ্বলে আমরাও ইহলোকের জ্বালা যন্ত্রণা অনেকাংসে ভুলিয়া থাকি,—সুতরাং কাব্যালোচনা আমাদিগের অকুশলের নিমিত্ত নহে। যাহা অকুশলের নিমিত্ত নহে, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন?"—

উত্তর এই যে, আমরা কাব্যকে একবারে পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না; বলিতেছি কুৎসিত কাব্যের পরিত্যাগ ও সৎকাব্যের অল্প সেবা কর। সৎকাব্য বলিয়া তাহাতে ব্যসনী হওয়া উচিত নহে; যেহেতু ব্যসনী হইলে কাব্যের শুভফল গ্রহ হয় না। ধীরতা ও সদ্বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক অল্প অল্প সেবা করিলে তৎপরিপাক দশায় কাব্যান্তর্গত শুভফল অনুভূত হইলেও হইতে পারে। কাব্য-নির্ম্মাতার যদি নির্ম্মাণ নৈপুণ্য থাকে, আর পাঠকের মন যদি পাঠ মাত্রেই সেই বর্ণনীয় বিষয়ে উপনীত হয়, তাহা হইলেই, সেই সৎকাব্য দ্বারা নিম্ন লিখিত ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে বটে। যথা,—

যে মনুষ্যে দয়া, দাক্ষিণ্য, করুণা, মৈত্রী, পুণ্য লিপ্সা ও পাপ-জিহাসা প্রভৃতি সদ্গুণের অভাব বা অনুদ্রেক আছে,—সৎকাব্য সেবা করিলে হয় ত তত্তাবৎ গুণের উদ্রেক হইতে পারে। স্বর্গবাসী-দিগের সুখসমৃদ্ধি দেখিয়া হয় ত পুণ্যলিপ্সার উদয় হইতে পারে—নারকীদিগের নরক যন্ত্রণা দেখিয়া হয় ত পাপজিহাসা জন্মিতে

পারে—ধনি-দিগের ভ্রুকুটিভঙ্গী দেখিয়া হয় ত ধনবিরাগ উপস্থিত হইতে পারে—হিংসার অনিষ্ট পরিণাম দেখিয়া হয় ত মৈত্রীভাবের উদয় হইতে পারে—অন্ধ-পঙ্গু প্রভৃতি দরিদ্র ও দরিদ্রনিবাস সন্দর্শন করিয়া হয় ত করুণা বৃত্তির উদয় হইতে পারে এবং যুদ্ধবীরদিগের অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া হয় ত উৎসাহিতা ও ওজস্বিতা জন্মিতে পারে। দান-বীরদিগের সদাশয়তা ও বদান্যতা দেখিয়া হয় ত সেই সেই গুণের উদ্রেক হইতে পারে। অতএব, যে সকল কাব্য দ্বারা তোমার বা জগতের উক্তবিধ উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে, সে সকল কাব্যের পরিসেবা করিতে আমাদের নিষেধ নাই। ব্যসনী না হইয়া সৎ-কাব্যের পরিসেবা আর ব্যসনী হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রের আন্দোলন করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমাদের মত। এই মত কেবল আমাদের নহে, পূর্ব্বপণ্ডিতগণেরও বটে। যথা,—

“তে উত্তমা যৈঃ ক্রিয়তে সচ্ছাস্ত্রস্য নিষেবনম্।
সত্কাব্যং যে চ সেবন্তে তে জনা মধ্যমা মতাঃ॥”

অর্থ এই যে, যাঁহারা জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, পূর্ব্বপণ্ডিত দিগের মতে তাঁহারাই উত্তম। যাঁহারা সৎকাব্যের সেবা করেন, পূর্ব্বপণ্ডিতগণের মতে তাঁহারা মধ্যম। অসৎশাস্ত্রের ও অসৎকাব্যের সেবকেরাই তাঁহাদের মতে অধম।

যদি বল “তত্ত্বচিন্তা করিতে হইলে ভাষান্তর শিক্ষার অপেক্ষা করে, কেবল বঙ্গভাষায় হয় না, যেহেতু বঙ্গভাষার অবস্থা এখনও বিচার শিক্ষার উপযোগী হয় নাই।”

এ কথারও অনেক উত্তর আছে। তন্মধ্যে প্রধানতম উত্তর এই যে, হতাশ না হইয়া, উপেক্ষা না করিয়া, চেষ্টা কর,—চেষ্টা করিলে

ঈপ্সিত ফল অবশ্যই লব্ধ হইবে। যে সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে বর্ষীয়সী হইয়াছেন, জীর্ণতমা হইয়াছেন, একবার সেই সংস্কৃতভাষার শৈশব কাল চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে যে, বঙ্গভাষাও ইচ্ছানুরূপ ফল-প্রসব করিতে পারিবে কি না।

প্রথমকালে সংস্কৃতভাষায় কি ছিল?—কেবল বস্তুবোধক গুটি-কতক নাম, আর ক্রিয়াবোধক গুটিকতক শব্দ (ধাতু) ছিল। যে শশধরকে আজ আমরা শত শত নামে উল্লেখ করিতেছি, তাহার দুই-টি মাত্র নাম ছিল। ক্রমে দশ, পঞ্চদশ, বিংশতি-টি (ইহা নিঘণ্টুর পূর্ব্বে) নাম প্রকাশ পাইল। এইরূপে ক্রমে শব্দ ও শব্দ বিন্যাস ভঙ্গী অর্থ ও অর্থ-চাতুর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখনও ব্যাকরণ হয় নাই। ক্রমে নাম, ধাতু, আখ্যাত ও নিপাত,—শব্দের এই চতুর্ব্বিধ জাতি স্থির হইল। এই সময় এক এক-টি করিয়া শব্দ অধ্যয়ন করিতে হয়—শব্দ পারায়ণের শেষ হয় না—অধ্যেতাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ। এক সময়ে যে সংস্কৃতভাষার এবংবিধ অবস্থা ছিল, তাহা বেদ দেখিলেই প্রতীতি হয়। যথা,—

"বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদপাঠবিহিতানাম
শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ, নান্তং জগাম॥"

অর্থ এই যে বৃহস্পতি বক্তা, ইন্দ্র অধ্যেতা, অধ্যয়নকাল দৈব-পরিমাণের সহস্র বৎসর। তথাপি এক একটি করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া শব্দ পারায়ণ শেষ হয় নাই। বোধ হয় এই উন্নতির সময়েই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল। এবংবিধ সময়েই ব্যাকরণের আবশ্যক।

ব্যাকরণ বলিলে এক্ষণে পাণিনি-ব্যাকরণ বুঝায়। প্রথমপ্রসূত

ব্যাকরণ তাহা নহে। প্রথমে যে কিরূপ ব্যাকরণ জন্মিয়াছিল, এখন আর তাহা অনুভূত হয় না। কেহ কেহ বলেন, পাণিনির পূর্ব্বে 'মাহেশ' নামক ব্যাকরণ ছিল, তাহাই প্রথম প্রস্তুত। এ কথা কতদূর সত্য, বলিতে পারি না। অনেকানেক প্রাচীন পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আবার অনেক পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, 'মাহেশ' নামক কোন স্বতন্ত্র ব্যাকরণ নাই, ছিলও না। পাণিনি, কাত্যায়ন, ও পতঞ্জলি,—এই মুনিত্রয়বিনির্ম্মিত সূত্র, বৃত্তি ও ভাষ্য,—এই গ্রন্থ ত্রয়েরই নাম মাহেশ। উহার 'মাহেশ' নাম হইবার কারণ এই যে, পাণিনি ও কাত্যায়ন মহেশ্বরের উপাসনায় সিদ্ধ হইয়া তদীয় উপদিষ্ট পদ্ধতিতে উক্ত ব্যাকরণ রচনা করেন। ফল, পাণিনির পূর্ব্বে 'মাহেশ' নামক ব্যকরণ না থাকিলেও অন্যবিধ ব্যাকরণ ছিল সন্দেহ নাই। যেহেতু পাণিনিকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাকরণের মত খণ্ডন করিতে দৃষ্ট হয়। কথাসরিৎসাগর নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে, পাণিনির পূর্ব্বে ঐন্দ্র ও চান্দ্র প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। পাণিনির আয়ু এক্ষণে অন্যূন ২৫০০ বৎসর। এই মহামুনিকৃত বিস্তীর্ণ ব্যাকরণের প্রচারের পরও অনেক অভাব হইয়াছিল। কাত্যায়ন বৃত্তিনির্ম্মাণ দ্বারা সেই অভাবের পূরণ করেন। বৃত্তি-প্রচারের পরেও ন্যূনতা দৃষ্ট হইল। পতঞ্জলি, ভাষ্য নির্ম্মাণ দ্বারা তাহার পরিহার করিলেন। ভাষ্যপ্রচারের পরেও বৈকল্য লক্ষ্য হইল। তাহার পরিপূরণ নিমিত্ত কৈয়টাচার্য্য টীকা করিলেন। ইহাতেও অসম্পূর্ণতা। সেই অসম্পূর্ণতা নিরাকরণের নিমিত্ত বিবরণকার প্রভৃতি আচার্য্যেরা প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাকরণ-টি এতদিনের পর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হইল। এখন আর এমন কোন ভাব বা

পদার্থ দৃষ্ট হয় না, যাহা সংস্কৃত দ্বারা প্রকাশ করা না যায়। এই যেমন সংস্কৃত ভাষার অদ্ভুত পরিণাম দৃষ্ট হয়, এইরূপ বঙ্গভাষারও হইতে পারে—হতাশ্বাস হইবার বিষয় কি ?—

অপিচ, "द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च"

বিদ্যা দ্বিবিধ। এক কার্য্যাবসানা অপর অনুভবাবসানা। যে বিদ্যাকে বহিঃকার্য্যে উপনীত করা যায়—কার্য্যে উপনীত করিতে পারিলে যে বিদ্যা দ্বারা বাহিরের (সংসারের) উন্নতি হয়—(এই উন্নতির নাম বাহ্যোন্নতি) সেই সকল বিদ্যার নাম কার্য্যাবসানা। ইহার নামান্তর অপরা ও বিজ্ঞান। শিল্প যুদ্ধ-জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি ঐ কার্য্যাবসানা বা অপরা বিদ্যার জাতি। আর যে বিদ্যাকে কোন সাংসারিক কার্য্যে নিয়োগ করা যায় না—সাংসারিক উন্নতি বা বাহ্যোন্নতি হওয়া যে বিদ্যা দ্বারা সম্ভবে না—কেবল অনুভব করাই যাহার প্রয়োজন—প্রকৃত প্রস্তাবে অনুভূত হইলে যে বিদ্যা অনুভবকর্ত্তার চিত্তোৎকর্ষ বা আত্মোৎকর্ষ জন্মায়—সেই বিদ্যার নাম অনুভবাবসানা। এই অনুভবাবসানা বিদ্যার নামান্তর পরা বিদ্যা ও রহস্যবিদ্যা। উপনিষদ্ ও দর্শন প্রভৃতি এই পরা বিদ্যার জাতি। উক্ত দ্বিবিধ বিদ্যার ফলও প্রধানতঃ দ্বিবিধ। প্রথমবিধের প্রধান ফল সাংসারিক উন্নতি বা বাহ্যোন্নতি, আর দ্বিতীয়বিধের মুখ্য ফল আত্মোন্নতি বা আত্মোৎকর্ষ। এতদ্ভিন্ন উভয় বিদ্যারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবান্তর ফলও আছে। সে ফল উক্ত প্রধানফলের সহিত সংসৃষ্ট; অর্থাৎ, কার্য্যাবসানা বিদ্যা কদাচিৎ আত্মোৎকর্ষফল স্পর্শ করিবার চেষ্টা পায়—এবং অনুভবাবসানা বিদ্যাও কখন কখন কার্য্যোন্নতি ফলের স্পর্শ চেষ্টা পায়। অতএব, উক্ত উভয়বিধ বিদ্যাই শ্রেয়স্কামী মানবের সেব্য। যদিও

আমরা কদাচিৎ প্রতিবন্ধক বশতঃ কার্য্যাবসানা বিদ্যাকে কার্য্যে উপনীত করিতে না পারি—তথাপি তাহার আন্দোলন করা উচিত। হেতু, তদ্দ্বারা কোন সময়ে না কোন সময়ে চিত্তোৎকর্ষফলের লাভ সম্ভাবনা আছে। এইরূপ, অনুভবাবসানা বিদ্যাকে অনুভবে উপনীত করিতে না পারিলেও তাহার সেব্বা করা কর্ত্তব্য; কেন না, তাহার দ্বারা তদীয় অবান্তরফল লাভের প্রত্যাশা আছে। অন্য কিছু না হউক, অন্ততঃ তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনাও আছে। মনে কর, বেদবিদ্যা (পূর্ব্বকাণ্ড) এক-টি কার্য্যাবসানা বিদ্যা; কেন না যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্পাদনের নিমিত্ত উহার আবির্ভাব। যদিও আমরা যাগ-যজ্ঞ করি না, তথাপি উহা জ্ঞানে রাখিতে দোষ কি? বেদ পড়িলে অন্য ফল না হউক,—পুরাকালের রীতি, নীতি, মানব ও মানবীয় আচার ব্যবহার প্রভৃতি ত জানা যাইতে পারিবে!—অন্ততঃ দশ-টা কথা বলিবার ত অবলম্বন হইতে পারিবে!—

"पुरा किल वेदमधीत्य त्वरितं वक्तारो भवन्ति।"

আদিম কালের ব্রাহ্মণেরা অনেকে কেবল বক্তা হইবার জন্যই বেদ পড়িতেন। না পড়িবেন কেন?—বক্তৃত্বশক্তি কি সুখ-সাধন সামগ্রী নহে?—অতএব, কোন না কোন দার্শনিকপদার্থ বাঙ্গালাভাষায় আনীত হইলে এবং তাহার আলোচনা করিলে, কিছুমাত্র অপকার নাই—প্রত্যুত কোন না কোন উপকার আছে।

কেহ কেহ বলেন, "না,—দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় কিছুমাত্র উপকার নাই। দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে মনুষ্য কেবল বাচাল হয়, আর বিচারমল্ল হয়। আর কিছুই হয় না। দর্শনশাস্ত্রের সমস্তই কল্পনাময়, পরীক্ষার বাহির, সুতরাং তদুল্লিখিত ফলও খ-পুষ্পতুল্য।

অতএব বৃথা কালব্যয় না করিয়া, যাহাতে আপনার হিত হয়—জগতের উন্নতি হয়—অন্যের উপকার হয়—এরূপ শাস্ত্রের চর্চ্চা কর। যথা জ্যোতিঃ-শিল্প-ভৈষজ্য প্রভৃতি।”*

কেহ কেহ ইহার উত্তর করেন, “হাঁ,—এই উপদেশ বাক্য-টি শুনিতে মিষ্ট বটে, হিতকারীও বটে; কিন্তু, যদি উহার একদেশে “দর্শনশাস্ত্রের ফল খ-পুষ্পতুল্য” এই ভ্রম কলুষিত অংশটুক্ সংলগ্ন না থাকিত—এবং উহার বক্তৃগণ যদি ঐ স্থানটিতে গিয়া ভ্রমান্ধ না হইতেন—তাহা হইলেই ঐ উপদেশ যথার্থ উপকারে আসিত। আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা ইহা বোধগম্য করিতে পারেন না যে, জ্যোতিঃ-শিল্প-ভৈষজ্যাদি যাবদীয় বিজ্ঞান, সমস্তই জ্ঞানশাস্ত্রের গাত্রৈকদেশে সংলগ্ন আছে। আপোগণ্ড শিশুরা নিরন্তর আহার লাভ করিয়া

---

* সংস্কৃত লেখকদিগের মধ্যেও এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা জ্যোতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, “**सफलं ज्यौतिषं शास्त्रं**” জ্যোতিঃশাস্ত্রই সফল, আর সমস্তই নিষ্ফল। শিল্পীরা বলেন “**कारवीर्य्यवनाकु: शिल्पं समनुतिष्ठ—विश्वकर्म्माणमुपास्व**” শিল্পেরই অনুষ্ঠান কর—বিশ্বকর্ম্মারই উপাসনা কর। বৈদ্যেরা বলেন, “**हिताय जगतां धाता आयुर्व्वेदस्य निर्म्ममे।**” জগতের হিতের নিমিত্ত বিধাতা স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব, জগতের মধ্যে যে কিছু হিতকর বস্তু আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদই প্রধান। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেন “**एक एव सुहृद्धर्म्मो निधनेऽप्यनुयाति यः—**” জীবের ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ, ধর্ম্ম ভিন্ন অনুষ্ঠেয় বস্তু আর কিছুই নাই। পৌরাণিক মহাশয়েরা বলেন “**शार्गालीं योनिमाप्नुयात्**” তর্কশাস্ত্র পড়িলে মনুষ্য শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়; অতএব তর্ক শাস্ত্র কেহ যেন না পড়ে। পরিশেষে তত্ত্বচিন্তকেরা বলেন “**ज्ञानमेव परं श्रेय:—**” একমাত্র জ্ঞানই পরম কল্যাণের কারণ। এইরূপ, স্ব স্ব শাস্ত্রে শিষ্যের আস্থা জন্মাইবার নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ফলের উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরন্তু চরমে, সকলেরই জ্ঞানশাস্ত্রের উৎকর্ষতা স্বীকার করিতে হইয়াছে।

পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, সেই আহার তাহারা কাহার প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইতেছে। অপ্রবিষ্ট জ্ঞানালোক অসভ্য জাতিরা স্বচ্ছন্দজাত বৃক্ষ-শিলাদি ভৌতিকবস্তু ও ক্ষিতি, জল, পবনাদি ভূত-পিণ্ড লইয়া ভোগোপকরণ নির্ম্মাণ করিতেছে, কিন্তু তাহারাও জানে না যে, সেই সমস্ত পার্থিব বস্তু তাহারা কি ভাবে, কি গতিকে, কাহার প্রসাদে লাভ করিতেছে। আমরাও যে, আহার ব্যবহার, গত্যাগতিপ্রভৃতি চেতনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি,—ইহা যে কি,—কাহার বলে করিতেছি, আমরাও তাহা সহজ জ্ঞানে অবগত নহি। এইরূপ, উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাও অবগত নহেন যে, তাঁহারা কাহার প্রসাদাৎ সেই সকল শিল্প-ভৈষজ্যাদির বীজোদ্ধার ও তাহাকে বিস্তার করিতে সমর্থ হইতেছেন। বিবেচনা হয় যে, অন্তর্দৃষ্টি না থাকাতেই তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব শাস্ত্রের মূল ও জীবন বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞানশাস্ত্র চর্চ্চার যে কি ফল—ও তজ্জন্মা সুখ যে কি সুখ—তাহা আমরা কথা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

"वर्णयितुं न शक्यते गिरा तत् स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते।"

যদি কাহারও তজ্জাতীয় চিত্ত থাকে, তবে তিনিই আপনা আপনি বুঝিতে পারিবেন। সহসা অন্যে পারিবে না।

অপিচ, জ্ঞানশাস্ত্রের একটা সামান্য অঙ্গ-ফলের প্রতি দৃষ্টি চালনা কর, বুঝিতে পারিবে যে, অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত ইহার কি তারতম্য আছে।

"व्याधिरनिष्टसंस्पर्शात् श्रमादिष्टविवर्जनात्।
दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः सम्प्रवर्त्तते॥"

ব্যাধি, আগন্তুক-অনিষ্ট অর্থাৎ কণ্টকবেধাদি, শ্রম, আর অন্নাদি ইষ্ট বস্তুর অভাব বা অপ্রাপ্তি,—এই চারি প্রকার কারণ হইতে শারীর-দুঃখ উৎপন্ন হয়।

> “तदाततत्पतिकारोत्थ सततस्वाविचिन्तनात् ।
> आधिव्याधि प्रशमनं क्रियायोगद्वयेन तु ॥”

ভৈষজ্য দ্বারা ব্যাধি, উপানৎ প্রভৃতি দ্বারা কণ্টক বেধাদি, অনায়াস কর্ম্ম দ্বারা শ্রম, ও অন্নাদি আহরণ দ্বারা ইষ্ট বস্তুর অভাব জনিত দুঃখের শান্তি হয়। চতুর্বিধ উপায় দ্বারা যেমন কথিত চতুর্বিধ দুঃখের শান্তি করা যায়—তেমনি আবার একমাত্র উপায় দ্বারাও উক্ত চতুর্বিধ দুঃখের নিবৃত্তি করা যায়। সে উপায় কি? না অবিচিন্তন; অর্থাৎ তত্তৎকালে তত্তৎ বিষয় হইতে মনকে আচ্ছিন্ন করিয়া অন্যত্র স্থাপন (যাহাকে আমরা ভুলিয়া থাকা বা অন্যমনস্ক বলিয়া ব্যবহার করি)। অত্যন্ত অন্যমনস্ক অবস্থায় যে, বাহ্য সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় না, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব মনকে ইচ্ছানুরূপ আয়ত্ত ও আত্মেচ্ছার অধীন করিবার শক্তি কাহার আছে?—তাদৃশ শক্তি না ভৈষজ্য বিদ্যার, না শিল্পবিদ্যার, না জ্যোতির্বিদ্যার,—কাহারও নাই। উহা কেবল জ্ঞানাঙ্গশাস্ত্রেরই আছে। (জ্ঞানাঙ্গশাস্ত্র—যোগ)।

অপিচ, ভৈষজ্য বিদ্যা যে অন্যের দুঃখ হরণ করেন বলিয়া শ্লাঘা করেন—ভালই—কিন্তু, তাঁহাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করা যাউক—“দুঃখ উপস্থিত হইলে পর তাহার নিবারণ করা ভাল? কি এক বারে দুঃখোৎপত্তির মূলোচ্ছেদ করিয়া দেওয়া ভাল?—এস্থলে ইচ্ছা না থাকিলেও ভৈষজ্য-বিদ্যাকে বলিতে হইবে যে, তাহার মূলোচ্ছেদ করাই ভাল। যদি তাহাই স্থির হয়, তবে, তাঁহাদের এমন কি ঔষধ

আছে যে তদ্দ্বারা দুঃখোৎপত্তির মূলোচ্ছেদ হইবে?—তাহা তাঁহাদের নাই। চতুর্ব্বিধ শারীর-দুঃখের মধ্যে, মাত্র ব্যাধিজ দুঃখই তাঁহারা নিবারণ করিতে পারেন। তাহাও আবার কার্য্যরূপ অর্থাৎ প্রকাশ হইলে পর। তাহার পূর্ব্বরূপ অর্থাৎ কারণ-অবস্থার বিনাশ করিতে পারেন না। পরন্তু আহার-বিহারাদির ব্যতিক্রম, শীত-বাত-আতপ-বর্ষা প্রভৃতির ব্যতিসেবা, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার আতিশয্য,—ইত্যাদি বাহ্য-কারণ হইতে যেমন মনুষ্যের দুঃখোৎপত্তি হয়; তেমনি শোক, হর্ষ, আবেগ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বিকার হইতেও দুঃখোৎপত্তি হয়। জ্বরাদি যেমন শরীরের রোগ—কামাদি তেমনি মনের রোগ। শারীর-রোগ যেমন শরীরকে জীর্ণ করে, মানস-রোগও তেমনি মনকে জীর্ণ করে। অতএব, তাঁহাদের এমন ঔষধ কি আছে যে তাঁহারা মানস-রোগের নিবারণ করিবেন?—অথবা কাম-ক্রোধাদির বিলয় করিবেন?—উহা তাঁহারা পারিবেন না। মানস রোগ নিবারণের অদ্বিতীয় ঔষধ কেবল জ্ঞানশাস্ত্রেই আছে, অন্যত্র নাই।

"मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्या-मर्द्दितं जगत्।"

মন এবং দেহ, এই উভয়কেই অধিকার করিয়া মনুষ্যের দুঃখোৎপত্তি হইতেছে। তন্মধ্যে মানস দুঃখই প্রবল; যেহেতু মন উত্তপ্ত হইলে শরীর আপনা হইতে তাপযুক্ত হয়।

"मानसेनहि दुःखेन शरीरमुपतप्यते।
अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्भसंस्थ-मिवोदकम्॥"

যেমন কুম্ভাবয়ব লৌহ প্রতপ্ত হইলে তন্মধ্যস্থ সলিলও প্রতপ্ত হয়, তেমনি মন উত্তপ্ত হইলে শরীরও উত্তপ্ত হয়। মন যদি তাপস্পৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সহস্র ব্যতিক্রম ঘটনা হইলেও শরীর সুস্থ থাকে।

"मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्नि-मिवाम्बुना ।
प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शारीर-मुपशाम्यति ॥"

এই জন্য,—বুদ্ধিমান্ মনুষ্য অগ্রে জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা মানসব্যাধির নিবারণ করিবেন, মানস তাপ বিনিবৃত্ত হইলে শারীর-তাপ স্বতই নিবৃত্ত হইবে। "মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে—কি শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ?"—ইহার নির্ণয় গ্রন্থ মধ্যে প্রদর্শিত হইবে। স্থূল কথা এই যে প্রবলপরাক্রম মানস-তাপ নিবারণ করিবার অধিকার না ভৈষজ্য বিদ্যার, না শিল্পবিদ্যার, কাহারও নাই, উহা কেবল জ্ঞানশাস্ত্রের আছে। ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হইবে না। যেহেতু দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশ স্থলই ঐ অংশের প্রতিপাদক। যাঁহারা দর্শনচর্চ্চা করিবেন, তাঁহারা তত্তৎস্থানে উহার বহুপ্রমাণ পাইবেন এবং সেই সকল প্রমাণ পরীক্ষিত কি অপরীক্ষিত, তাহাও বুঝিতে পারিবেন; সুতরাং জ্ঞানের সর্ব্বদুঃখ-নিবারকত্ব শক্তির পরিচয় ও পরীক্ষাপ্রকার স্বতন্ত্র স্থানে বিন্যাস করা বৃথা।

এস্থলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানশাস্ত্র পড়িলেই যে তত্তৎফলভাগী হওয়া যায়, তাহা নহে। কেবল জ্ঞানশাস্ত্র কেন, কোন শাস্ত্রেরই সেরূপ শক্তি নাই। তাহাতে বিলক্ষণ অভ্যাস যোগ, অনুষ্ঠান, সমাহিত হইয়া নিয়মিতরূপে আচরণ এবং তাহার দার্ঢ্য-সংস্থাপন অপেক্ষা করে। শাস্ত্রকারেরা বলেন,—

"ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञान तत्परः ।
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थ-मशेषतः ॥"

জ্ঞান বা বিজ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্তই গ্রন্থাভ্যাসের আবশ্যকতা। ধান্যার্থী ব্যক্তি যেমন সর্ব্বসমেত আহরণ পূর্ব্বক ধান্য ভাগ গ্রহণ

করিয়া অবশিষ্ট (পলাল) ভাগ ত্যাগ করে;—সেই রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রন্থাহরণ পূর্ব্বক তদুপদিষ্টপথে বিচরণ করত অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানাদির অর্জন করিবেন। আত্মা যখন সেই সমস্ত আভ্যাসিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে, তখনই তিনি কথিতবিধ ফলভোগের অধিকারী হইবেন। অতএব, যখন জ্ঞানশাস্ত্রের সামান্যেতর অঙ্গফলের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের মুখ্যফল তুলিত হয় না, তখন "দর্শনশাস্ত্র নিষ্ফল"—এই ভ্রম-কলুষিত বাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের পক্ষে অতীব গর্হণীয় সন্দেহ নাই।"

যাহাই হউক, গ্রন্থাবতরণ-প্রসঙ্গে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; কিন্তু প্রকৃত বিস্মরণ হই নাই। যে উদ্দেশে এত দূর বলা, তাহা কিছু কিছু করিয়া প্রত্যেক প্রাসঙ্গিক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া আসিয়াছি। তথাপি, উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, আজ্ কাল বঙ্গ-সমাজ যেমন কাব্য ইতিহাসাদির চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, এইরূপ, জ্ঞানচর্চ্চাও করুন। তাহাতে অন্যবিধ ফল না হউক, নিম্নলিখিত ফল হইবার বাধা নাই। যথা, "শিশুবৎ সম্মুগ্ধজ্ঞানের বিলয়—বাক্‌বিশুদ্ধির অভাবদূরীকরণ—আধ্যাত্মিক ঔৎকর্ষ্য ও আধ্যাত্মিক সুখ লাভ—ভৌতিক সুখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সুখের পরিশুদ্ধতা বোধ—মনের শক্তিবৃদ্ধি—ধর্ম্মপ্রবণতা—তৎসঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উদ্রেক—ইত্যাদি——"

সংসারের সকল মনুষ্য যদি এই সকল স্বর্গীয় গুণে বিভূষিত হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ হয়; পরন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে যাহা হউক, আমি আপন মনের ঔৎসুক্যনিবৃত্তি, বঙ্গভাষার অবয়ব বৃদ্ধি ও বঙ্গীয়ছাত্রগণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ-

থানি প্রস্তুত করিলাম। এতদ্দ্বারা যদি মামকীন উদ্দেশ্যের কোন অংশও সংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও আমি ধন্য হইব। ইহার শিরোদেশে 'সাঙ্খ্য-দর্শন' এই মুকুটার্পণ করিলাম বটে, কিন্তু এতন্মধ্যে সাঙ্খ্য-ব্যতীত অন্যান্য দর্শনেরও মত সন্নিবিষ্ট আছে। সাঙ্খ্যমতের আধিক্য থাকাতেই তদনুসারী 'সাঙ্খ্য-দর্শন' নাম দিয়াছি।

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন মূলবাক্য ও টীকাকারগণের ব্যাখ্যাবাক্য অবলম্বন করিয়া তত্তদ্বাক্যের অভিপ্রায় যত দূর আকর্ষণ করা যাইতে পারে, তত দূর আকর্ষণ করিয়া বঙ্গীয় রীতিতে গ্রথিত করিয়াছি।

ইহাতে কোন প্রকার স্ব-কল্পিত বিষয় সন্নিবিষ্ট করি নাই। যে যে স্থানে কল্পিত বলিয়া সংশয় অর্থাৎ তাহা মূলে আছে কি না, এইরূপ মনোভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই সেই স্থানের আলম্বন বাক্যগুলি (সংস্কৃত) উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

ইহাতে ভ্রম-প্রমাদ ও অনভিজ্ঞতাদি-জনিত দোষ থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; যদি থাকে, সহৃদয়গণ মৎপ্রতি অনুগ্রহ বিতরণ পূর্ব্বক সেইগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন এবং আমাকে জ্ঞাত করাইবেন। এক্ষণে আশা বা প্রার্থনা এই যে, ক্রমে এতদ্বিধ গ্রন্থের ভূরি প্রচার হউক এবং বাঙ্গালাভাষার ছাত্রগণ নাটকাদি বিনিঃসৃত নিম্নশ্রেণীর আনন্দ অপেক্ষা উচ্চতর দার্শনিক আনন্দে নিবিষ্টচেতা হউন।
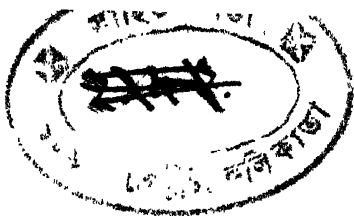
Sankhya Philosophy

সাঙ্খ্য-দর্শন।

দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ ও সংক্ষিপ্তসংবাদ।

মানবীয় জ্ঞান দুই প্রকার। এক আজানিক অপর সম্পাদ্য। আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই জ্ঞান মনুষ্যের অভ্যাস ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য উহার নাম আজানিক (স্বাভাবিক); আর যাহা অভ্যাস দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়, তাহা সম্পাদ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্য জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান। মোক্ষ-বিষয়কজ্ঞান অর্থাৎ আত্মা কি?—ঈশ্বর কি? —জগৎ কি?—এই মোক্ষোপযোগি প্রশ্ন ত্রয়ের তত্ত্ব যে জ্ঞানের বিষয়, তাহাই জ্ঞান, আর তন্নির্ণায়ক শাস্ত্রের নাম জ্ঞানশাস্ত্র। শিল্প বা শিল্পোপযোগি বস্তু বা বস্তু-শক্তি যে জ্ঞানের বিষয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহাকে 'বিজ্ঞান' আর তদ্বিষয়ের গ্রন্থকে বিজ্ঞান গ্রন্থ বা বিজ্ঞানশাস্ত্র বলিয়াছেন। এই নির্ণয়,

> "शास्त्रमभ्यस्य मेधावी ज्ञान-विज्ञान-तत्परः।"
>
> मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः।

ইত্যাদি বাক্য হইতে লব্ধ হয়। অপিচ, দৃশ্ ধাতু নিষ্পন্ন "দর্শন" এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। যদি দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ
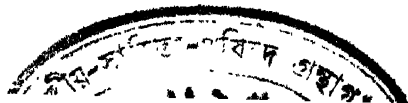
জ্ঞান হইল, তবে দর্শন শাস্ত্র বলিলে আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের নির্ণয় আছে তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন ও জ্ঞানশাস্ত্র একই বস্তু। (ভারতবর্ষীয় জ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে প্রসঙ্গ বশতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও প্রবেশ থাকা দৃষ্ট হয়)। ভারতবর্ষে যত প্রকার দর্শন শাস্ত্র আছে, তত্তাবতের মত এক রূপ না হইলেও, 'মুক্তি' (অবস্থাবিশেষ) এ অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই সম্পূর্ণ বিবাদ। কেহ কেহ মুক্তির স্বরূপ ও উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ঈশ্বর মানেন, বেদ মানেন, অদৃষ্ট মানেন। কেহ বা ঈশ্বর মানেন না, অদৃষ্ট মানেন, বেদও মানেন। কেহ বা তত্রিতয়ের কিছুই মানেন না। যাঁহারা বেদ মানিলেন না, তাঁহারা নাস্তিক-খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বেদ মানিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও আস্তিক থাকিলেন। সাংখ্যকার কপিল, ঈশ্বর মানেন না। প্রচলিত ক্রিয়া কাণ্ড যাঁহার মত, সেই মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনিও ঈশ্বর মানেন না। তথাপি তাঁহারা আস্তিক। (ইহাঁদের মতে বেদ ও পরলোক অমান্য কারীরাই নাস্তিক)। কেবল একমাত্র বেদের মর্য্যাদা-বলেই ইহাঁরা নাস্তিক অপবাদ হইতে মুক্ত আছেন; আর, বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফল, বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অপলাপ কারীরাই বাস্তবিক নাস্তিক। নাস্তিক ও আস্তিক, উভয় দর্শন মিলিত করিলে সমুদায়ের সংখ্যা পাঁচ হয়। আস্তিক দর্শন তিন ও নাস্তিক দর্শন দুই। প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ বিদ্যার গণনা স্থলে সাংখ্যকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য করিয়া "মীমাংসা ন্যায় এব চ" এই

বলিয়া মীমাংসা ও ন্যায় এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। আবার স্থানান্তরে, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" এই বলিয়া সাংখ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আস্তিক দর্শন প্রধানতঃ তিনই হইতেছে। তবে যে ষড়্দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কেবল প্রসিদ্ধি নহে গ্রন্থভেদও দৃষ্ট হয়, তাহার সংগতি এইরূপ,—
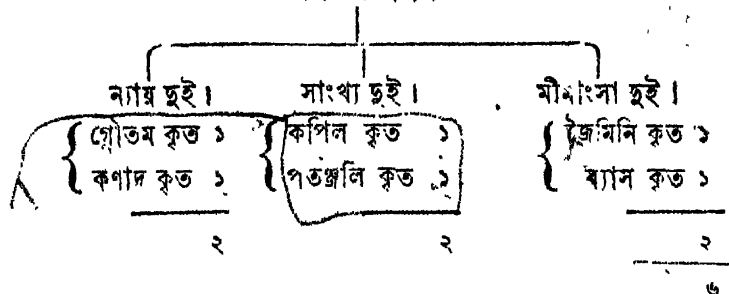
গৌতমের কৃত ন্যায়, কণাদের কৃত বৈশেষিক, কপিলের কৃত নিরীশ্বর সাংখ্য, পতঞ্জলির কৃত সেশ্বর সাঙ্খ্য ও যোগ, জৈমিনির কৃত পূর্ব্বমীমাংসা, ব্যাসের কৃত উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত নামে প্রসিদ্ধ।

নাস্তিক দর্শনেরও এই রূপ প্রস্থান ভেদ আছে। যথা,—
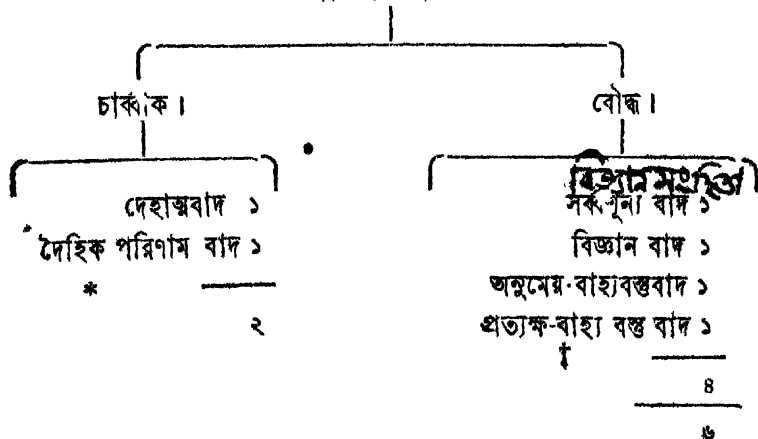
সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন। এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল, বা অগ্র-পশ্চাৎ-ভাব নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণয় করা যায় না ; কারণ, এতৎ-সম্বন্ধে কোন বিশ্বস্তলিপি নাই। অনুমান করিয়া নির্ণয় করাও সুকঠিন ; কেন না, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষ দৃষ্টি দেখা যায়। যদি এক

---

* "শুক্রশোণিতের পরিণামজনিত এই দৃশ্যমান দেহই আত্মা, এত দতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র আত্মা নাই,—এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদন যে শাস্ত্রে আছে তাহার নাম দেহাত্মবাদ।

এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ আত্মা নহে, ইহাতে যে চৈতন্যসংযোগ আছে, তাহাই আত্মা; কিন্তু সে চৈতন্য দৈহিক পরিণামবিশেষের ধর্ম্ম, তাহা দেহ যন্ত্রের পরিপূর্ণতা কালে উৎপন্ন হয়—অসম্পূর্ণতাকালে ধ্বংস হয়,—ইহা প্রতিপাদন ও মনই আত্মা ইহার নির্ণয় নিমিত্ত দৈহিক পরিণামবিশেষ বাদের প্রবৃত্তি।

† এ জগতে সৎ অর্থাৎ সত্য বস্তু কিছু নাই ; দেহ নষ্ট হইলেই মুক্তি ; এই সিদ্ধান্তের অনুশাসন যাহাতে আছে তাহার নাম সর্ব্বশূন্যবাদ।

বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যয় বা আলয়বিজ্ঞান নামক বুদ্ধির মিথ্যাত্ব নাই—তবে কি না তাহা ক্ষণিক।

উৎপন্ন হইতেছে ধ্বংস হইতেছে এই রূপ বিজ্ঞান ধারাই (প্রবাহ) সত্য। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্ষণিক। এই সত্য বিজ্ঞান ধারাই জগদাকারে ক্রীড়া করিতেছে। যাহা বাহিরে দৃষ্ট হয়, উহার অস্তিত্ব বাহিরে নহে সকলই অন্তরে এবং ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, নদ, নদী, সাগর, শৈল প্রভৃতি যে কিছু বাহ্য দৃশ্য দেখিতেছ—উহার একটিও কথিত নামক বস্তু নহে। সকলই প্রত্যয় বা আলয় বিজ্ঞান ; এই রূপ যে শাস্ত্রে বলে, তাহার নাম ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ।

ক্ষণিকানুমেয়বাহ্যবস্তুবাদ প্রায় এইরূপ ; প্রভেদ এই যে, উহারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব একবারে বিলোপ করে না। বলে, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি অন্তরে হয় বটে কিন্তু তাহার সত্তা বাহিরে। তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তবে কি না প্রত্যয়ের কোন আলম্বন থাকা উচিত, এই বলিয়া বাহ্য বস্তুর সত্তা বাহিরে থাকা অনুমিত হয়।

প্রত্যক্ষবাহ্যবস্তুবাদীরা বলেন, "না,—বাহ্য বস্তু বাহিরে বটে, প্রত্যক্ষ-সিদ্ধও বটে,—পরন্তু তাহা ক্ষণিক। আলয় বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায়—আবার তৎসঙ্গে বিলীন হয়। হিমালয় যে চিরকাল আছে, এই প্রতীতি কেবল প্রত্যয় প্রবাহের মহিমা। উহা পূর্ব্বাবধি অখণ্ডদণ্ডায়মান নহে।

সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায়, তবেই ওরূপ ঘটনা সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক কল্পনা করাও যায় না; কেন না, দর্শন-পরম্পরার লিখন ভঙ্গী ও পুরাণাদি আখ্যায়িকা-গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, দর্শনকারেরা বিভিন্ন সময়ের লোক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্র-পশ্চাদ্ভাব বিদ্যমান আছে। যখন ব্যাসদেবের জন্ম হয় নাই, রামায়ণ তখন বর্ষীয়ান্; এই রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ যখন অনুপস্থিত কালের উদরস্থ, শ্রুতি তখন যুবতী। তদ্‌বধি শ্রুতিতেও কপিলের উল্লেখ আছে। এইরূপ,স্থানে স্থানে গৌতমেরও উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। আবার দর্শন সকলের লিখনগতি অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবত্।" এই বলিয়া কপিল বৈশেষিক কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। জৈমিনিও "বাদরায়ণস্যান-পেক্ষত্বাত্।" বাদরায়ণকে পূজা করিতেছেন। আবার ব্যাস "অধিকারং জৈমিনিঃ" এই বলিয়া জৈমিনিকে স্মরণ করিতেছেন, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই বাক্যে পাতঞ্জলকেও খণ্ডন করিতেছেন। গৌতমও "মহদণু মহত্বাত্" এই সূত্র দ্বারা কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন। আবার কণাদও গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয় যে,দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ কাল নির্ণয় করিবার ত কোন উপায়ই নাই। যদিও চেষ্টা করিলে বৎসর গণনায় ১,২ করিয়া ব্যাস পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ ব্যাসের ওদিকে আর বৎসর নাই, কেবল যুগ—দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য !! এই জন্য বলি, দার্শনিক ইতিবৃত্ত গ্রন্থপীঠ মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে, যাহা কিছু

বলা যায়, তাহা কেবল মনের আবেগ নিবৃত্তি করা মাত্র। যাহাই হউক, অন্ততঃ মনোবেগ নিবৃত্তির নিমিত্তও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে।

যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম-নির্ম্মাতা কে?—অনুসন্ধান করিতে গেলে পক্ষাপক্ষ উপস্থিত হইবে। এক পক্ষের অভিপ্রায় এই যে "নাস্তিক সম্প্রদায়ের কোন আদি পুরুষই যুক্তিপথের আবির্ভাবক। যে হেতু সমস্ত আস্তিক-শাস্ত্র হৈতুক [শুষ্কতর্ক বা নাস্তিকোচিত তর্ক] শাস্ত্রের নিন্দায় পরিব্যাপ্ত। পুরাণের ত কথাই নাই, বৃদ্ধমহর্ষি মনুও—

"योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः।
स साधुभिर्बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥" ২।১১.

এই বলিয়া হেতু শাস্ত্রের নিন্দা ও তদবলম্বিদিগকে বৈদিক দ.. হইতে বহিষ্কৃত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। বেদভাগ অন্বেষণ করিলেও "नैषा तर्केण मतिरापनेया" "तद्धैक आहु रसदेवेद मग्र आसीत्" ইত্যাদি প্রকার নাস্তিক্য-নিন্দাসূচক বহুতরবাক্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আস্তিক্য উন্নতির পূর্ব্বে যে হেতুশাস্ত্রের জন্ম, তাহাতে আর সংশয় নাই।"

সম্ভব বটে। আদিমকালের ঋষিদিগের বালবৎ সরল-হৃদয়-নিষ্পাদিত বেদনির্ণয় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাচরণ ও বস্তুনির্ণয় করাই সম্ভব—দ্বিতীয় কালের লোকদিগের ক্রমে কৌটিল্য-কবলিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ—তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুরুষের বৈদিক মতে আস্থা উচ্চটিত হওয়াই অনুভবসিদ্ধ—আস্থা উচ্চটিত হওয়াতেই তাহাদের পূর্ব্বাগত মত'কে 'দূরীভব' করিবার চেষ্টা জন্মিয়াছিল—তৎপরিপাকদশায় বিশ্বাসের সর্ব্বনাশক তর্ক উদিত হইয়াছিল।

ক্রমে চির-সংস্কারাপন্ন পুরাতন ঋষিদিগের মধ্যে একটা কোলাহল উপস্থিত হইল। তদ্দৃষ্টে সেই দ্বিতীয় কালের নাস্তিকসম-তীক্ষ্ণবুদ্ধি আস্তিক ঋষিরা সেই নাস্তিকোদ্ভাবিত নূতন পথ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগের মত খণ্ডন ও বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিল—এ কথা অনুভব বিরুদ্ধ নহে।

অপিচ; নাস্তিক্য আদিজীবের সম্বন্ধে স্বাভাবিক নহে। আস্তিক্যই স্বাভাবিক। আস্তিক্যের বীজ সরলতা, নাস্তিক্যের বীজ বক্রভাব। বক্রভাব সারল্যের পরভাবী, ইহা যুক্তিশাস্ত্রের স্থিরসিদ্ধান্ত। জল-বায়ু-অগ্নি ও গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-মণ্ডিত জগদ্‌যন্ত্রের অদ্ভুতব্যাপার ও আশ্চর্য্য ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আদিম মনুষ্যের অবক্রহৃদয়ে আস্তিক্য বা অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরভাবের উদয় ও তাহার দৃঢ় স্থিতি—ক্রমে সেই সারল্য মূলক অমোঘ-আস্তিক্যের প্রাবল্য জন্মিয়াছিল। তন্নিবন্ধন বিবিধ যাগ যজ্ঞ পূজা হোমাদির স্রোত প্রবৃদ্ধ হইয়া ছিল। অনুমান হয়, অপেক্ষাকৃত বক্র হৃদয় তৎপরভবিক লোকেরা ক্রমে সেই সমস্ত কার্য্যে শ্রান্ত, ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া, অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া, কিসে সেই সকল অকিঞ্চিৎকর কৃচ্ছ্রসাধ্য ক্রিয়াকলাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় সেই চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়াছিল; তাহাতেই ক্রমে তর্ক অঙ্কুরিত—ক্রমে শাখা পল্লব—ক্রমে তাহার ফল অর্থাৎ তর্কগ্রন্থ। নাস্তিক্য ও আস্তিক্যের এবংবিধ কার্য্য-কারণ ভাব বা সম্বন্ধ-পরম্পরায় প্রতি দৃষ্টি চালনা করিলে অনুমিত হয় যে নাস্তিকেরাই যুক্তিশাস্ত্রের প্রথম নির্ম্মাতা।

অপর পক্ষ বলেন, "না,—আস্তিকেরাই আদি-তার্কিক। নাস্তিক-

দিগের মস্তকোত্তোলনের পূর্ব্বেও আস্তিকদলে তর্ক প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে কি না তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি যে কিছু আস্তিক-গ্রন্থ আছে, সমস্তই তর্ক বা যুক্তি পরিপূর্ণ। আস্তিক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক জন্মান্তরীণ পাপ বা ঐহিক-দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া তত্তাবতের বিঘ্ন জন্মাইতে আরম্ভ করিলে, হিতৈষী আস্তিকেরা সেই সমস্ত পাষণ্ড দিগের দলনের নিমিত্ত শাস্ত্রের তত্তৎ স্থান হইতে খণ্ড-যুক্তি সকল আহরণ পূর্ব্বক আস্তিক্য রক্ষার উপযোগী যুক্তিশাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। নাস্তিক-খ্যাতিপ্রাপ্ত সেই সমস্ত ঋষিসন্তানেরা পশ্চাৎ সেই সমস্ত আর্য্যমতিদিগের দেখাদেখি স্বমত রক্ষার নিমিত্ত দুর্গস্বরূপ যুক্তি কাণ্ড অবলম্বন করত বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছে।"

এইরূপ পক্ষাপক্ষ থাকাতে দর্শন সাধারণের কথা দূরে থাকুক, আস্তিক-ষড়্‌দর্শনের প্রাথম্য বা পূর্ব্বাপরীভাব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, যদি শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ আস্তিক ষড়্‌দর্শনের অগ্র-পশ্চাৎ-ভাব নির্ণয় হইতে পারে। এতৎসম্বন্ধে যে একটা স্বভাবিক আত্ম-প্রত্যয় [ছয়টা দর্শন এক সময়ে হয় নাই] আছে, তাহাও অবন্ধ্য হইতে পারে।

শঙ্করাচার্য্য একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, "কপিল সাঙ্খ্য শাস্ত্রের বক্তা এবং সগর সন্তানগণের দাহ কর্ত্তা"—এই সম্বাদে লোক সকল ভ্রান্ত হইয়া বর্ত্তমান সাঙ্খ্যের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু উহা সেই আদিবিদ্বান্ বিখ্যাত মহিমা ঋষি-কপিলের না হইলেও পারে। কেন না, শাস্ত্রান্তরে অন্য এক কপিলের কথা শুনা যায়।"*

---

*"कपिलमितिश्रुति सामान्यमात्रत्वात् अन्यस्य च कपिलस्य सगर पुत्राणां प्रतप्तु वासुदेवनाम्नः स्मरणात्।" [শারীরক ভাষ্য]।

এতাবতা শঙ্করাচার্য্যের মতে দুই কপিল। এক কপিল অতি প্রাচীন, অন্য কপিল ব্যাসাদির পরভবিক। প্রচলিত সাঙ্খ্য নব্য কপিলের। নব্য কপিল পুরাতন কপিলের মননের ধন [পদার্থ] লইয়া স্বীয় মতের যোগে সূত্র রচনা করিয়াছেন।

যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পায়। যথা,—

১ম। কপিলের একটি নাম 'আদি বিদ্বান্'। সাঙ্খ্যদর্শন আদিম হইলে তৎপ্রণেতা কপিলের ঐ নাম সার্থক হয়।

২য়। কপিল যে আদিজ্ঞানী ও বহুপ্রাচীন, এবিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সকলেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যথা—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।"
[শ্রুতি]

"আদৌ যো জায়মানঞ্চ কপিলং জনয়েদৃষিম্।
প্রসূতং বিভৃয়াজ্‌জ্ঞানৈ স্তং পশ্যেৎ পরমেশ্বরম্॥" [স্মৃতি]

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ঃ পঞ্চশিখস্তথা॥" [পুরাণ]

প্রথমোল্লেখিত শ্রুতিবাক্যটির মর্ম্মার্থ এই যে, যিনি কপিল-ঋষিকে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে ধ্যানযোগে দর্শন করিবেক। কপিলের প্রাচীনতা বোধক বাক্য এইরূপ অনেক আছে, কাপিল দর্শন আদিম হইলে সে সমস্তই রক্ষা পায়।

৩য়। 'তত্ত্ব সমাস' নামক অন্য এক প্রকার কাপিল সূত্র আছে। তাহাতে অন্য কোন দর্শনের প্রতি কটাক্ষ করা নাই। আদি

গ্রন্থে যেরূপ নিরপেক্ষ রচনা থাকা উচিত, তাহাতে তাহাই আছে। *

৪র্থ। পরভবিক গ্রন্থে কৌশলাধিক্য, আয়তনে বিস্তার ও পদার্থ সমন্বয়ের সংক্ষেপ হইয়া থাকে। কাপিল দর্শন আদিম হইলে এ যুক্তিও রক্ষা পায়। কপিল চতুর্বিংশতি পদার্থ দ্বারা যাহা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, গৌতম তাহা ষোড়শ পদার্থে, কণাদ তাহা সপ্ত পদার্থে, পূর্ব্ব মীমাংসা তাহা ষট্ পদার্থে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। পূর্ব্ব মীমাংসা যাহা ষট্ পদার্থে, উত্তর মীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত তাহা এক পদার্থেই পর্য্যাপ্ত করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া আমাদের বোধ হয় যে, সাংখ্যদর্শনই আদিম; পাতঞ্জল উহার সমসাময়িক, ন্যায় তৎপরভবিক, তৎপরে বৈশেষিক, তৎপশ্চাৎ পূর্ব্বমীমাংসা, বেদান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

কোন মতে 'সংখ্যা' হইতে 'সাঙ্খ্য' এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যথা—

"संख्यां प्रकुर्व्वते चैव प्रकृतिञ्च प्रचक्षते।
तत्त्वानि च चतुर्विंशत् तेन साङ्ख्याः प्रकीर्त्तिताः॥"

ইহার অর্থ এই যে পদার্থ সংখ্যার নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ থাকাতেই কাপিল দর্শন 'সাংখ্য' নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কেহ বলেন, তাহাও নহে। তবে কি? না, সংখ্যাশব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ জ্ঞানের উপদেশ যে শাস্ত্রে আছে, তাহারই নাম সাঙ্খ্য; পরন্তু সর্ব্ব প্রথমে ইহার (কাপিল দর্শনের) আবির্ভাব হওয়াতেই লোকে ইহাকে 'সাঙ্খ্য' নামে প্রখ্যাত করিয়াছে।

মহর্ষি কপিলের জন্ম ভূমির নির্ণয় হয় না। তাহা না হউক, ইনি যে একজন আর্য্যাবর্ত্তীয় ঋষি, তাহাতে আর সংশয় নাই। পুরাণে

---

* যদি সাঙ্খ্যদর্শনই আদিম হয়, তবে এই তত্ত্ব সমাস সূত্রই তাহা। অথবা সে সাঙ্খ্য অর্থাৎ পুরাতন কপিলের সাঙ্খ্য বা সাক্ষাৎ লিপি লোপ হইয়া গিয়াছে।

বর্ণিত আছে যে,কপিল দেবহুতির পুত্র এবং বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। কিন্তু তিনি যে কোন্ কপিল, নব্য কি প্রাচীন, তাহা বলা যায় না।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সমস্ত আর্ষ-গ্রন্থই সাঙ্খ্য মতে পরিব্যাপ্ত আছে। সাঙ্খ্য মত যে অতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা কেবল কপিল হইতে হয় নাই, ক্রমে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা হইতেই হইয়াছে।

সাংখ্য-শাস্ত্রের আদি-আচার্য্য কপিল—তৎশিষ্য আসুরি ও বোঢ়ু। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখাচার্য্য—তৎশিষ্য ঈশ্বরকৃষ্ণ। কেহ বলেন, (ঈশ্বরকৃষ্ণ ঋষি-শিষ্য নহেন)।

আমরা আসুরির গ্রন্থ দেখিতে পাই না। পঞ্চশিখের গ্রন্থ না পাইলেও তাঁহার খণ্ড খণ্ড সূত্র অনেক পাওয়া যায় এবং ঈশ্বর কৃষ্ণের এক খানি কারিকা গ্রন্থ (সাঙ্খ্য-সপ্ততি) পাইতেছি।

ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন, মহামুনি পঞ্চশিখাচার্য্য হইতেই সাঙ্খ্য শাস্ত্র বহু বিস্তৃত হইয়াছে। যথা,—

"এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

(উপরে ইহার অর্থ এক প্রকার বলা হইয়াছে)।

পঞ্চশিখাচার্য্য সাঙ্খ্য শাস্ত্রকে পরিবর্দ্ধিত করিলে পর, উহার নাম 'ষষ্টিতন্ত্র' হইয়াছিল। ভাব এই যে, পঞ্চশিখাচার্য্য কপিল সম্মত ষষ্টি-সংখ্যক পদার্থের উপর (৬০) ষষ্টি-সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যে সকল বিষয়ের উপর তাঁহার গ্রন্থ ছিল সে সকল বিষয় এই—

প্রকৃতি-প্রভৃতি মৌলিকবিষয়ের—১০
বিপর্য্যয় অর্থাৎ অজ্ঞান বিষয়ের—৫
সন্তোষ অর্থাৎ আনন্দ বিষয়ের—৯
ইন্দ্রিয়াসামর্থ্যবিষয়ের——২৮

পঞ্চশিখ এই ষষ্টি পদার্থের প্রত্যেক পদার্থের উপর এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। এক্ষণে যাহা

সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মার ক্ষমতা-বিশেষ-বিষয়ের উপর——৮

৬০

পাওয়া যায় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
ষড়ধ্যায়ী (সূত্র)	কপিল।
তত্ত্বসমাস (সূত্র)	কপিল।
প্রবচন ভাষ্য	বিজ্ঞান ভিক্ষু।
তত্ত্ব সমাস ব্যাখ্যা	যতি
সাংখ্য সপ্ততি	ঈশ্বর কৃষ্ণ
তত্ত্বকৌমুদী	বাচস্পতি মিশ্র
সাংখ্যসার	বিজ্ঞান ভিক্ষু
সাংখ্যচন্দ্রিকা	
রাজ বৃত্তি	ভোজরাজ
সাংখ্যসংগ্রহ	(পঞ্চ শিখাচার্য্যের বাক্য সংগ্রহ)

ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থ সমাপ্তি কালে লিখিয়াছেন যে "আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতাশ্চাপি" আমি ষষ্টি-তন্ত্রের সমস্ত পদার্থই সংক্ষেপে বলিলাম, কিন্তু আখ্যায়িকা ও তর্কচ্ছটা পরিত্যাগ করিলাম। এই লিখন ভঙ্গীতে বোধ হয়, পঞ্চশিখাচার্য্য ও আসুরি প্রভৃতি ঋষিরা আখ্যায়িকা এবং বাদ-কথার যোগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ফল, সাংখ্য শাস্ত্র এত বিস্তৃত এবং তাহার অধিকার এত প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তত্তাবৎ লোপ হওয়াতে এখন আর কোন টি সাংখ্যের সম্মত, কোন টি অসম্মত, তাহা আর নির্ণয় করা যায় না। সেই কারণে, আমি এতন্মধ্যে সাংখ্যানুগত পুরাণ, স্মৃতি ও অনেক বৈদ্যক বাক্যকেও সাংখ্য সম্মত বলিয়া নিবিষ্ট করিয়াছি।

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, জ্ঞান সম্বন্ধে সাংখ্য এবং অন্যান্য দর্শনের মত।

সাংখ্য শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্ব্যূহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ সমূহ। রোগসমূহ, রোগের কারণসমূহ, আরোগ্যসমূহ ও ভৈষজ্য-সমূহ,—এই চারি-টি সমূহ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য,

তেমনি দুঃখ, দুঃখনিবৃত্তি, দুখোৎপত্তির হেতু, দুঃখনিবৃত্তির উপায়, এই চারি-টি সমূহ সাংখ্য দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য। সাংখ্যকার উক্ত চারি-টি সমূহের বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে অনেক জাগতিক (বাহ্য) পদার্থেরও পরীক্ষা করিয়াছেন। পরন্তু দুঃখ-পদার্থ-টির পরীক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেন, দুঃখকে পরীক্ষারূঢ় করিবার প্রয়োজন কি?—উহা সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনা শক্তির প্রতিকূল-অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব 'দুঃখ নাই' বলিয়া কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না? এ সংশয়ও কেহ করেন না। দুঃখ-নিবা-রণের কোন উপায় নাই বলিয়াও কেহ মস্তকোত্তোলন করেন না; সুতরাং ঐ সকল অংশ প্রতিপাদন করা সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সাংখ্য-শাস্ত্রের কেন, জ্ঞাতজ্ঞাপন করা কোন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য নহে। "অজ্ঞাত জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর বোধ জন্মানই শাস্ত্রের কার্য্য।

"তবে সাংখ্য-দর্শনের উপদেশ্য বিষয় কি?" যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর নহে, যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই, সাংখ্য-শাস্ত্রের তাহাই উপদেশ্য।

"এমন বিষয় কি আছে যে যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই? অথবা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধ হয় না? দেখা যায়, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মাদি ধাতুর বৈষম্যনিবন্ধন শারীর সমুত্থিত দুঃখ নিরাকরণের শত শত উপায় বৈদ্যক গ্রন্থে আছে। বিষয়-বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তি জন্য মানস দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তন্নিবারণের উপায়ীভূত মনোজ্ঞ-স্ত্রী-পান-ভোজন-বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি লৌকিক পদার্থও জগতে প্রচুর পরিমাণে

আছে। নীতিশাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে, নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে, আগন্তুক দুঃখও আক্রম করিতে পারে না। তবে, আর এমন কি গুপ্ত পদার্থ আছে, যাহা উপদেশ করিবার জন্য সাঙ্খ্যকার ব্যগ্র ?”—

“দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ হয় কি না—যদি হয়—তবে তাহা কি উপায়ে ?”—এই অংশ সাধারণবোধের গম্য নহে। অতএব এই অংশই সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ্য। লোক মধ্যে দুঃখ নিবৃত্তির যে সকল উপায় দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা যে নিশ্চিত দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয় না। যদিও নিবৃত্তি হয়, তথাপি পুনর্ব্বার সেই দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। আত্যন্তিক নিবৃত্তি কদাচ হয় না। পরন্তু শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিলে অবশ্য দুঃখনিবৃত্তি হইবে এবং সে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের মতে এই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির নামই মোক্ষ বা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি। শাস্ত্রে ইহাকে পরম পুরুষার্থ বলে। মনুষ্য যে কিছু প্রার্থনা করে, দুঃখ নিকারণের জন্যই করে। মনুষ্য, দুঃখ নিবৃত্তি বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়, উভয়কেই প্রার্থনা করে,—এজন্য উভয়ই পুরুষার্থ বটে, কিন্তু লৌকিক উপায় দ্বারা যে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, তাহা আত্যন্তিক নিবৃত্তি নহে। এজন্য উহা পুরুষার্থ হইলেও পরম-পুরুষার্থ নহে।

জৈমিনি বা জৈমিনির ন্যায় যজ্ঞবিদ্যা-বিশারদ ঋষিরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই “নিরন্তর সুখই হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্র না হয়” এইরূপ অব্যভিচারী অভিনিবেশ আছে। অতএব, ঐরূপ অভিনিবেশের পরিপূর্ত্তি (নিরবিচ্ছিন্ন সুখ-ধারা সম্ভোগ) মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে কি না—তর্ক করিলে ‘ঘটে না’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। জৈমিনির মতে উঁহাই স্বর্গ-সুখ। যথা,—

"यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्।
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्॥"

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ধারা সম্ভোগই স্বর্গ ভোগ। এই স্বর্গই মনুষ্যের সুখতৃষ্ণার বিশ্রান্তি ভূমি। উহাই পরম পুরুষার্থ, উহাকেই মুক্তি বলা যায়, উহাকেই অমৃতভোগ বলা যায়। যাজ্ঞিক দিগের মত এই যে, বেদোক্ত কার্য্যকলাপ, ঐ অলৌকিক সুখলাভের অদ্বিতীয় উপায়।

যজ্ঞবিদ্যা-ব্যবসায়ীদিগের এই মত কপিলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। কপিল বেদ মানেন, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল-জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু কথিত প্রকারে নহে। বলেন, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গ-সুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখমিশ্র ও অনিত্য। কারণ, যাগ মাত্রেই হিংসা সাধ্য। পশুঘাত বা বীজ বিনাশ ব্যতিরেকে কোন যাগই নিষ্পন্ন হয় না; সুতরাং হিংসাঘটিত কার্য্যকলাপ কি রূপে নিরবচ্ছিন্ন শুভ ফল প্রসব করিতে পারে?—অতএব ক্রিয়াকাণ্ড কখনই তাদৃশ সুখের জনক নহে। একমাত্র হিংসাদি-দোষরহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের জনক এবং তাহাই মুক্তির উপায়। *

অপিচ, যেমন উপায় বিশেষ দ্বারা দুঃখবিশেষ কিছু কাল স্থগিত থাকে, আবার উপায়-বিশেষে তদপেক্ষা অধিক কাল স্থগিত থাকে, এবং কোন উপায়ে একপ্রকার দুঃখের শান্তি, কোন উপায়ে বা দুই ও ততোধিক দুঃখের শান্তি হয়, তেমনি কোন না কোন উপায়ে

---

* সাংখ্য মতে, বীজ বিনাশ করিলেও পাপ জন্মে। কিন্তু অজ-বীজ ভিন্ন। যে বীজ হইতে আর অঙ্কুর হইবে না, সেই বীজের নাম 'অজ'। অহিংসা-ঘটিত ব্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা। ৩ বৎসর, কোন কোন বীজের ৫ বৎসর পর্য্যন্ত অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে।

সকল দুঃখের শান্তি হইতে পারে এবং সে শান্তি অনন্ত কালের জন্য হইতেও পারে। দুঃখের কারণ ধ্বংস করিতে পারিলে দুঃখ উৎপত্তি হইবে কেন? পরন্তু যে উপায়ে উহা সিদ্ধ হইবে, সে উপায় লোক মধ্যে নাই, যজ্ঞবিদ্যার মধ্যেও নাই। কারণ, সে উপায় তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি, মহৎ-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন এবং চিৎস্বরূপ"—এইরূপ প্রত্যয় সুদৃঢ় ও সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি বলিয়া থাকে। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ, এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ কি?—তাহার অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি (জগৎভাবাপন্না), এতদুভয়ের যাথার্থ্য অনুসন্ধান করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যয় জন্মিতে পারে।

আত্মা ও জগৎ, এই দুই বস্তুর পরীক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে জগৎ (বাহ্য-বস্তু) পরীক্ষাই প্রথম। তাহাতে কপিলের মত এই যে, জগতের মূলতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি, আর আত্মতত্ত্ব এক; এই পঁচিশটি মাত্র তত্ত্ব। এতন্মধ্যে যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টির নাম জগৎ, তাহার ব্যষ্টি এই—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার; রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র, গন্ধ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, শব্দ-তন্মাত্র, একাদশ-ইন্দ্রিয় ও মহাভূত পাঁচ।

কপিল, স্ব-প্রতিজ্ঞাত এই সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল পরীক্ষারূঢ় করাও—প্রমাণ সহ হইলে গ্রহণ করিও। এক্ষণে প্রকৃতি কি?—অহঙ্কার কি?—এ সকল জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত রাখ। যদ্দ্বারা বস্তু-নিশ্চয় হইবে তাহারই চিন্তা কর।

তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞান প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে, লয় হইতেছে। সকল জ্ঞানই বিষয়কে অবগাহন করিতেছে। "সর্ব্বং জ্ঞানং স-বিষয়ং" জ্ঞান মাত্রই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয়। কোন বস্তু অবগাহন করিতেছে না, অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কখনই হয় না। "রূপঞ্চ দৃশ্যতে, ন চাস্তি চক্ষুঃ" রূপ দেখিতেছি, কিন্তু চক্ষু নাই; এবাক্য যেমন প্রামাদিক [প্রলাপ] "জ্ঞান হইতেছে বিষয় নাই" এ কথা ততোধিক প্রামাদিক। অতএব জ্ঞানমাত্রেরই কোন না কোন বিষয় আছে, বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই—বিষয় আছে জ্ঞান নাই—এরূপ দৃষ্ট হয় না। বিষয় বলিলেই জ্ঞানাবগাহিত-বিষয় বুঝিতে হইবে, আবার জ্ঞান বলিলেও বিষয়-যুক্ত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অবিযুক্ত সম্বন্ধ,—জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতদুভয়েরও ঠিক্ সেইরূপ সম্বন্ধ।*

স্থিরচিত্তে বিবেচনা কর—সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর উত্থিত নানাবিধ জ্ঞান-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ টি যথার্থ [ঠিক্] জ্ঞান, তাহা চিনিয়া লইতে হইবে। একারণ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ উপদেশ করা আবশ্যক। তাহাতে কপিল এই রূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন যে, "অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান।" মর্ম্ম এই যে, অনধিগত অর্থাৎ যে বস্তু আর কখন জ্ঞানের বিষয় হয় নাই। অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর কালে যাহার বাধ বা বিলয় হয় না। ব্যবসায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযোগের অনন্তর "ইহা

---

* "জ্ঞেয়ং ন জ্ঞানং ব্যভিচরতি, তথা জ্ঞানম্।" (প্রশ্নভাষ্য।)

"সর্ব্বে সত্প্রত্যয়াঃ সালম্বনাঃ সত্প্রত্যয়ত্বাৎ॥" (তট্টীকা)

অমুক বস্তু” এইরূপ বিশেষাবধারণ হওয়া। এইরূপ অবস্থাপন্ন যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। সংস্কৃতভাষায় ইহা প্রজ্ঞা, সম্যক্ জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি, অনুভব প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রমাজ্ঞান, স্বীয় বিষয় হইতে কখনই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। প্রমা-জ্ঞানের বিষয় কখন বাধিত হয় না। যে বস্তু একবার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, সেই বস্তু যদি বারান্তরে বিষয় হয়, তবে তাহাকে প্রমা না বলিয়া “স্মৃতি” বলা যায়। কাহারও মতে উক্ত যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অনুভব, এই দুই প্রকার বিভাগ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের মতে জ্ঞান, শুদ্ধ অবাধিত-বস্তু অবগাহন করিলেই তাহা প্রমা হয়। বিভাগবাদীর মতে বিভাগের যে কি প্রয়োজন, তাহা পশ্চাদ্ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে যাহা প্রমা হইবে না, ঈদৃশ দুই এক-টি জ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রমাকে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি-পথে আনীত করা যাউক।

মনোযোগ কর। মন্দান্ধকার-নিমগ্ন একটি নাল, রজ্জু অথবা জল ধারা দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রমা নহে। কারণ, সেই সর্পাকার জ্ঞান সর্পরূপ বিষয় হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় এবং সেই সর্প-টিরও বাধ হয়। কারণ, “ঐ সাপ্” এই জ্ঞানের অব্যবহিত উত্তরকালে যদ্যপি দণ্ডোদ্দাম পূর্ব্বক আঘাত করিতে যাওয়া যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ভ্রমের অধিকরণ-টি প্রত্যক্ষ হয়, আর সে সর্প থাকে না। তখন জ্ঞানের ব্যবসায়াত্মক অংশ সত্যকেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ “ইহা সর্প নহে—ইহা জলধারা বা রজ্জু” —এইরূপে নিশ্চয় করে। “ইহা সর্প নহে” এই পরভাবি জ্ঞানের বাধ বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই অংশেই প্রমা, আর বিপরীত অংশে ভ্রম। এইরূপ, সংশয়-জ্ঞানও প্রমা নহে। কারণ, সংশয়স্থলে

বুদ্ধিবৃত্তি বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাতে ব্যবসায় (নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি) জন্মে না। “ইহা অমুক ? কি অমুক ?”—এই আকারে দোদুল্যমান হইতে থাকে। অতএব যাবৎ না বুদ্ধি একতর গামিনী হয়, তাবৎ কি প্রমা কি ভ্রম, কিছুই বলা যায় না। এইরূপ আকারের জ্ঞানকে সংশয় নামে ব্যবহার করা যায়। এতাবতা, জ্ঞানের “স্মৃতি” “প্রমা” “ভ্রম” “সংশয়” স্থূলতঃ এই চারিটি বিভাগ করা হইল। এতন্মধ্যে প্রমা-জ্ঞানই বিশেষ বিচার্য্য।

“উক্তবিধ প্রমার উৎপত্তি কি রূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণই বা কি ?—”কপিল প্রসঙ্গ ক্রমে এই সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সংক্ষেপে; যথা—“**द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थ-परिच्छित्तिः प्रमा तत्साधकं यत् तत्त्रिविधं प्रमाणम्।**” এই সূত্রটিকে আচার্য্যেরা বহু বিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়া আমরাও ইহাকে বিস্তার করিব।

[যদ্দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়।] বস্তুকে প্রমাণারূঢ় করার নামই পরীক্ষা। [এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে “প্রমাণ কত প্রকার ? এক প্রকার কি বিভিন্ন প্রকার ?” কপিল মতানুযায়ীরা উত্তর দিবেন] “যখন দেখা যাইতেছে বস্তু নানা বিধ এবং তাহাদের অবস্থাও অনেক বিধ; অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা, এবং সর্ব্ববিধ অবস্থাপন্ন বস্তুর পরীক্ষা হওয়াও আবশ্যক; তখন, স্থূল সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ পরিপূর্ণ বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটিমাত্র প্রমাণ উপস্থিত থাকিবে, ইহা অসম্ভব। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে। পরীক্ষাসাধক পদার্থ একটি হইলে,

যে কালে পরীক্ষিতব্য বস্তু বর্ত্তমান থাকে, সে কালে সেই পরীক্ষা সাধক সামগ্রী-টি না থাকিতেও পারে; যে কালে পরীক্ষা বর্ত্তমান, সে কালে পরিক্ষিতব্য না থাকিতেও পারে; এরূপ হইলে পরীক্ষা পদার্থ-টি অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ পরিহারের নিমিত্ত এমন কোন পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, যাহা কালত্রয় স্থায়ী হইতে পারে। প্রমাণ একটি হইলে ত্রৈকালিক পরীক্ষা সিদ্ধ হয় না। বর্ত্তমান-পরীক্ষার নিমিত্ত যেমন সর্ব্বসম্মত প্রত্যক্ষ উপস্থিত আছে, তেমনি অতীত ও অনাগত পরীক্ষার নিমিত্তও প্রমাণান্তর থাকা উচিত। আরও এক বিবেচনা আছে। পরীক্ষা কার্য্যটিকে জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হইবে। না করিলে, জগতের অসম্পূর্ণতা আপত্তি হয়। অতএব জগতের অবস্থা ও পদার্থ যেমন নানা, তেমনি তদ্গ্রাহক প্রমাণও নানা। *

প্রমাণের সংখ্যা-ঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬, প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩, প্রমাণ বাদী। † ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক, আর ঔপদেশিক। ইন্দ্রিয়

---

* "न प्रत्यक्षनिवृत्तिमात्रादभावनिश्चयः" "विद्यमानोऽप्यर्थ इन्द्रियाणां कालभेदेन विषयोऽविषयश्च भवति" "सम्भवति वाचान्यत्प्रमाणम्।"

[কাপিলসূত্র ও ভাষ্য।]

† "प्रत्यक्षमेकं चार्व्वाकाः काणाद-सुगतौ पुनः।
अनुमानञ्च तच्चापि साङ्ख्याः शब्दञ्च ते उभे॥
न्यायैकदेशिनोऽप्येवमुपमानञ्च केवलम्।
अर्थापत्त्या सहैतानि चत्वार्य्याहुः प्रभाकराः।
अभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा।
सम्भवैतिह्ययुक्तानि इति पौराणिका जगुः॥" [বেদান্তকারিকা।]

জন্য জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান যৌক্তিক, আর উপদেশ জন্য জ্ঞান ঔপদেশিক নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার নামান্তর যথাক্রমে প্রত্যক্ষ,অনুমতি ও শাব্দ। এতন্মধ্যে প্রত্যক্ষটি সর্ব্ববাদি সম্মত, ইহাতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না। প্রমাণ চিন্তকেরা বলেন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রমাণান্তরের জীবন, এজন্য অগ্রে প্রত্যক্ষের বিচার আবশ্যক। প্রত্যক্ষটি যথার্থরূপে নির্ণীত হইলে অন্য প্রমাণগুলি সহজ হইয়া আইসে। তদনুসারে,আমরাও সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষ, বিশেষতঃ চাক্ষুষ প্রমাণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

চক্ষুরিন্দ্রিয় ও চাক্ষুষ-জ্ঞান।

"চক্ষুরিন্দ্রিয় কি ?—কি প্রকারেই বা চক্ষুর্দ্বারা বস্তু-জ্ঞান জন্মে ?" —এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কোন বৌদ্ধ বলেন, " চক্ষুর কেন্দ্র স্থানে যে স্বচ্ছ-কৃষ্ণবর্ণ-গোল-লাঞ্ছিত অংশ দৃষ্ট হয়, লোকে যাহাকে " তারা " বা " চক্ষের মণি " বলে, উহার আর একটি নাম কৃষ্ণসার। চাক্ষুষ-জ্ঞানের প্রতি ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটিই কারণ ; কেন না, কৃষ্ণসার যন্ত্র অবিকৃত থাকিলেই বস্তু গ্রহ হয়, নচেৎ হয় না। সুতরাং ঐ কৃষ্ণসার যন্ত্রটিই ইন্দ্রিয়,তদ্ভিন্ন 'চক্ষুরিন্দ্রিয়' নামে অপর কোন স্বতন্ত্র বস্তু নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কৃষ্ণসারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ ভ্রম। " **অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং** " যেটি বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটি অতীন্দ্রিয়। কোন কালেই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমান কৃষ্ণসারটি তাহার অধিষ্ঠানস্থান মাত্র। অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) অধিষ্ঠিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বলা যে ভ্রম তাহা সহজ বোধ্য।

মনে কর। বিষয় ও ইন্দ্রিয়,এতদুভয়ের সংযোগ না হইলে কোন

ক্রমেই বস্তু-গ্রহ হইতে পারে না। সন্নিকর্ষ-ব্যতীত, বস্তুদ্বয়ের সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না। বিষয় এক প্রদেশে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে, সন্নিকর্ষের সম্ভাবনা কি? অতএব, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসন্নিকৃষ্টতা নিবন্ধন সংযোগ হইতে পারে না, সংযোগ না হইলেও উপলব্ধি হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি, সংযোগ ব্যতিরেকে মাত্র কৃষ্ণসার দ্বারা বস্তু-জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে এ জগতে আর কোন বস্তুই অপ্রকাশ থাকিত না। কৃষ্ণসার সকল সময়েই বর্ত্তমান আছে, বস্তুও সর্ব্বত্র নিপতিত আছে, তত্তাবতের জ্ঞান না হয় কেন? ব্যবহিত বস্তুই বা অজ্ঞাত থাকে কেন?—অপিচ, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দৃষ্ট হয়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য-বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই প্রকাশ করে। দীপ একটি প্রকাশক বস্তু। উহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, সে বস্তুকে প্রকাশ করিতেও পারে না। যদি পারিত, তবে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয় বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব, দূরস্থিত বস্তুর সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত যে, যে পদার্থ চক্ষু-গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া গোলক হইতে অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে। *

"সে পদার্থ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজ বিশেষ। সাংখ্যকার বলেন, সে বস্তু

* "নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বদা প্রাপ্তের্ব্বা" "দূরবস্তুনঃ সম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়ং বাচ্যং" "তন্ন ভৌতিকং"—(কপিল, বাচস্পতি ও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি।)

আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহং তত্ত্বের পরিণাম বিশেষ। চক্ষু ও চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত ও প্রক্রিয়া এইরূপ—

"কৃষ্ণসার যন্ত্রে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয। ঐ রশ্মি, সম-সূত্রপাত-ক্রমে ধারাকারে ও অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কৃষ্ণসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযোগ হইবা মাত্র আত্মাতে "ইহা অমুক বস্তু" ইত্যাকার জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পরন্তু দীপালোক যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্বন্ধেই বস্তু প্রকাশ করে, অচক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে করে না, সেইরূপ রশ্মিময় চক্ষুরিন্দ্রিয়ও মনঃ-সংযুক্ত ইহয়া রূপবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে, অন্যথা করে না। রূপহীন বস্তু বা অমনোযুক্ত চক্ষুঃ, চাক্ষুষজ্ঞানের অনধিকারী। ফল, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান জন্মে না। *

এই মত নৈয়ায়িকদিগের। সাংখ্য মত অন্যবিধ। সাংখ্যা-চার্য্যদিগের মত এই যে, ইন্দ্রিয় সকল ভৌতিক নহে; উহা আহঙ্কা-রিক। বিশেষতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় কোনক্রমেই ভৌতিক হইতে পারে না। কারণ, চক্ষু আপন অপেক্ষা ন্যূন বস্তু গ্রহণ করে, আবার বৃহৎপরি-মাণবস্তুও গ্রহণ করে। চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে সে কদাচ বৃহৎপরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ, কোন অল্পপরিমিত ভৌতিকবস্তুকে কোন বৃহৎ পরিমাণ বস্তু

---

* "রশ্ম্যর্থসন্নিকর্ষাত্তু তদ্গ্রহণং" "রশ্মির্গোলকাবচ্ছিন্নং তেজঃ" "রশ্মীষু সংহত্যকারিত্বং" "সংহননং বিষয়দেশে" "মানসত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগ এবহেতুঃ" (গৌতম ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি)। দুই চক্ষুর দুই কৃষ্ণসার হইতে দুইটি রশ্মিধারা নির্গত হইয়া তদুভয়ের অগ্রভাগ দৃশ্যবস্তুতে গিয়া সম্মিলিত হয়। একটি চক্ষু মুদিত করিলে অথবা নষ্ট হইলে অপর চক্ষুর বলবৃদ্ধি হয় ও তন্নির্গত রশ্মি কিঞ্চিৎ বিশীর্ণ ভাবে প্রসর্পিত হয়।

ব্যাপিতে দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে তদ্দ্বারা বিনা বিভাগে দূরস্থ বস্তুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে। যদ্যপি তেজের ঐরূপ শক্তি থাকা কল্পনা কর, কেন না সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছ যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপগুলি 'প্রভা'রূপে দূর প্রদেশে গমন করিতেছে এবং আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকেও ক্রোড়ীকৃত করিতেছে; তথাপি, তন্মধ্যে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি পরিচালন করা আবশ্যক। নির্ণয় কর দেখি 'প্রভা' বস্তুটি কি?— 'প্রভা' বস্তুটি আর কিছুই নয়, কেবল কতকগুলি বিরল অবয়ব তৈজস-পরমাণু মাত্র। সূক্ষ্ম-তৈজস পরমাণুর ঘনতমসংযোগ হইলে অগ্নি, আর বিরল ভাব ধারণ করিলে প্রভা; অগ্নি ও প্রভার এইমাত্র প্রভেদ। এখন বিবেচনা কর, যে সকল আগ্নেয়-পরমাণু দীপ শিখা (পুঞ্জীভূত আগ্নেয়-পরমাণু) হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে, পরস্পর বিরলভাবে দূর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সহিত দীপের বা তাহাদের পরস্পরের সংযোগ আছে কি না; 'নাই' একথা অবশ্য বলিতে হইবে। না বলিলে, "দাহ জন্মায় না কেন?"—ইত্যাদি অনেকবিধ আপত্তি উত্থিত হইবে। অতএব দীপের দৃষ্টান্তে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, কৃষ্ণসার হইতে যে সকল রশ্মি চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগেরও পরস্পরের সহিত পরস্পরের এবং কৃষ্ণসারের আর সংযোগ নাই। যদ্যপি না বল, ধারার ন্যায় সম্প্রসারণ শক্তি থাকা স্বীকার কর, তাহা হইলেও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। অপসর্পণ দেখিয়া চক্ষুকে তৈজস কল্পনা করিতেও পারিবে না। যেহেতু, ওরূপ অপসর্পণ শক্তি অন্য পদার্থেরও আছে। প্রাণ-বায়ু যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া অর্থাৎ দেহ ত্যাগ না করিয়াও প্রসর্পিত হয়, তাই বলিয়া কি চক্ষুকে বায়বীয় কল্পনা

করিবে ? অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ অতি দুর্ব্বল, আহঙ্কারিক পক্ষই প্রবল।

ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব পক্ষ যেরূপ সহজ বোধ্য, আহঙ্কারিক পক্ষ সেরূপ নহে। এপক্ষে কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও একাগ্রতার আবশ্যক। বিবেচনা কর, যাবৎবুদ্ধিবৃত্তির মূল অহংভাব। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিই অহংভাবের পরিণাম। কেন না, এজগতে যত প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান উপস্থিত হইতে দেখা যায়, তত্তাবতের সঙ্গে 'আমি' বা 'আমার' এবম্প্রকারের অহংভাব অনুস্যূত আছে। যদ্যপি স্থল বিশেষে অনেক সময়ে অহংভাবের জ্ঞাপক 'আমি' বা 'আমার' ইত্যাদি প্রকার শব্দের স্পষ্টত উল্লেখ হয় না; তথাপি তাহার অভ্যন্তর-মূলে উহা নিহিত আছে সংশয় নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে, 'অ' এই বর্ণটিকে সকল বর্ণের বীজ বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে; যেহেতু ঐ 'অ' সমুদায় শব্দের অভ্যন্তরে বা মূলে নিহিত আছে। কি প্রকারে ? প্রণিধান কর। কোন বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিবা মাত্র তন্মধ্য হইতে প্রথমতঃ একটি অবিকৃত সরল শব্দ সমুত্থিত হয়। অনন্তর সেই শব্দ অঙ্গুলির চাপে বিকৃত হইয়া নানা আকার ধারণ করে। সেই সকল বিকৃত স্বর স-রি-গ-ম ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। মানববাক্যও এই বাংশিক নিনাদের তুল্য নিয়মাক্রান্ত। প্রাণিদিগের প্রথমতঃ জাঠরাগ্নি ও প্রাণ-বায়ুর সহযোগে উদর কন্দর হইতে তদুভয়ের অভিঘাত জন্য একটা অবিকৃত সরল শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বিশুদ্ধ সরল শব্দটির নাম নাদ। এই নাদই ভবিষ্যৎধ্বনি সমুদায়ের বীজ। যতক্ষণ না উহা গলগহ্বরে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহা শ্রবণ-

---

* "ন তৈজসাপসর্পণাত্তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ।" (কপিল সূত্র)

যোগ্য হয় না। (মত বিশেষে নাদের উৎপত্তি স্থান উদরকন্দর, মত বিশেষে কণ্ঠনাল।) সেই নাদ বা ধ্বনি-বিশেষ প্রযত্নপ্রেরিত তাপ-সংযুক্ত ঔদর্য্য বায়ুর বলে গলগহ্বরে অভিঘাতিত হইলে পর যে আকার প্রাপ্ত হয় সেটি 'অ'। এই 'অ' পশ্চাৎ প্রযত্ন অনুসারে কণ্ঠ ও তালু প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত হইয়া 'আ' 'ই' 'উ' 'ক' 'খ' প্রভৃতি বর্ণের উৎপত্তি করে, সুতরাং ঐ 'অ'-ই সকল বর্ণের বীজ। 'অ' যেমন সমুদায় বর্ণের বীজ, সেইরূপ, অহংতত্ত্বও যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বীজ। 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' এই জ্ঞান হইতে 'আমার'—'আমার' এই জ্ঞান হইতে 'অমুক' ইত্যাদি। অতএব 'অহং'-জ্ঞান অবিকৃত, আর তৎপরভবিক জ্ঞান সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিকৃত এবং সে সকল জ্ঞান অহং-সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উপাদান (মূল কারণ) যখন ইন্দ্রিয়, তখন অবশ্যই ইন্দ্রিয়নিচয় আহঙ্কারিক অর্থাৎ অহংতত্ত্বের পরিণাম-বিশেষ হইবে। ইন্দ্রিয় যদি আহংকারিক নিশ্চয় হইল, তবে তাহাকে অনুভব করিতে হইলে বুদ্ধি-স্থলাভিষিক্ত করিয়া অনুভব করিতে হইবে। কেননা বুদ্ধির অব্যাপ্য পদার্থ জগতে নাই। আহঙ্কারিক ইন্দ্রিয়গণ যে আপন অপেক্ষা বৃহত্তম বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতে পারে, তাহা কেবল বুদ্ধির স্থানীয় বলিয়াই পারে।

এক্ষণে সাংখ্য মতের আহংকারিক চক্ষু যে প্রণালীতে বস্তু গ্রহণ করে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, মনোযোগ কর।—

চাক্ষুষপ্রক্রিয়া পক্ষে কপিলের অন্তরভিপ্রায় কি? তাহা ঠিক্ বলা যায় না। পরন্তু আচার্য্যদিগের বিভিন্ন অভিপ্রায় দৃষ্ট হয়। কোন আচার্য্য শক্তিবাদী,—কেহ বা শক্তি সহকৃত-বৃত্তি বাদী। শক্তিবাদী

আচার্য্যেরা বলেন, "কৃষ্ণসারের এক প্রকার বিষয়-গ্রাহিণী শক্তি আছে,—তাহাই চক্ষুরিন্দ্রিয় শব্দের বাচ্য। আমরা যাহা দেখি, তাহা দৃশ্যমান বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র। কৃষ্ণসার যখন স্বীয়-শক্তিতে আপনার স্বচ্ছাংশে বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তখনই জ্ঞান হয় "ইহা অমুক বস্তু"। *

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, " কৃষ্ণসার যদি ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় নহে। বল দেখি শক্তি পদার্থ-টি কি ? স্বতন্ত্র ? কি কাহারও অনুগত ? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে শক্তি, রূপ-প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন অর্থাৎ গুণ-পদার্থ। গুণ, কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হয় না সুতরাং শক্তিও আশ্রয় চ্যুত হইয়া দূরে প্রস্থিত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ-পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে ? মনে কর, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য গুণ আছে, পুষ্পের সৌরভ আছে,—কিন্তু দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি, জল, ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায় ? কখনই না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহযোগেই আইসে। যদি, অগ্নি পিণ্ড হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কৃষ্ণসার হইতে শক্তিও বিভক্ত হইয়া বিষয় প্রদেশে চলিয়া যায়

---

* এই মতটি কপিল সূত্র হইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না। তবে যে, কোন কোন আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন, বোধ হয় "শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ"— এই সূত্রটিই তাহার বীজ। যাহাই হউক, এই মতটি সাধারণতঃ প্রচলিত নহে।

এমত বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের বা বিষয়ের সম্পর্ক থাকে না। মনের সহিত সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তিও হইতে পারে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে। *

বৃত্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্য শক্তিবাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে যে বিষয় প্রদেশে যাইতে হইবে, বোধ হয় তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রায় নহে। শক্তিবাদীদিগের অভিপ্রায় এইরূপ হইতে পারে যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বস্থানে থাকিয়াই কার্য্য অর্থাৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। †

এই মতের চাক্ষুষ জ্ঞানোৎপত্তির প্রক্রিয়া এই রূপ—

মনে কর, একটি বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার যন্ত্র পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। মধ্যে শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই। এমত হইলে, চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ-শরীরে যেমন এক প্রকার বিষ্টম্ভ অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষ উপস্থিত হয়, অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি প্রবল বা কার্য্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তৎপ্রভাবে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংগত হয়, এই রূপ, কৃষ্ণসার যন্ত্র ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য হইবা মাত্র কৃষ্ণসার যন্ত্র-টি বিষ্টম্ভিত হইয়া প্রতিবিম্বগ্রাহিণী শক্তিকে কার্য্যোন্মুখী করিল এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্ভস্থ ভৌতিক-পদার্থ-বিশেষের বলে ধৃত করিল। সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি-বৃত্তিও

---

* "भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं" "विभागे हि सति तद्द्वारा चक्षुषः सूर्य्यादिसम्बन्धो न घटते, गुणत्वेन सर्पणाद्यक्रियानुपपत्तेश्च" (ভাষ্য)

† "अथवार्थप्रतिबिम्बोद्ग्रहणमेवार्थप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणां" (ভাষ্য) "प्रतिबिम्बोद्ग्राहिणी शक्तिरेव" "अयस्कान्तवत् सान्निध्यमात्रेण तथात्वं" (বাচস্পতি—তট্টীকা) "कृष्णसारार्थयोः साम्मुख्यमपेक्षते।" [নাগাভট্ট]

বৃক্ষাকারে পরিণত হইল। নিকটে আত্মা আছেন, সেই বৃক্ষাকারা বুদ্ধি-বৃত্তি আত্মচৈতন্যে প্রতিফলিত বা উজ্জ্বলিত হইবা মাত্র জ্ঞান হইল "এই বৃক্ষ," বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব যেরূপ হইয়াছিল, জ্ঞানের আকারও ঠিক্ সেই রূপ হইল। পরিমাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদয় বিশেষণ [ভঙ্গী বিশেষ] গুলি যুগপৎ ভান [ছাপ লাগার মতন] হইল। এইরূপে অন্তঃকরণ একবার যে আকারে পরিণত হয়, অন্তঃকরণের তদবধি সেই আকারে পরিণত হইবার এক অদ্ভুত শক্তি জন্মে। এই শক্তির নাম সংস্কার। এই সংস্কার চিরস্থায়ী অর্থাৎ যত কাল অন্তঃকরণ, তত কাল স্থায়ী। যে কোন প্রকারে হউক, একবার জ্ঞান হইলে [অর্থাৎ অন্তঃকরণে একটা বস্তুর ছাপ লাগিলে] তাহার সংস্কার অর্থাৎ অন্তঃকরণের সেই আকারে পুনঃ পরিণত হইবার শক্তি চিরকালই থাকে। যখন যখন সেই সেই সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে তখন তখনই অন্তঃকরণ সেই সেই আকার ধারণ করিবে। এই কারণে, বৃক্ষের অভাব হইলেও—চক্ষুঃ নিমীলিত করিলেও—প্রতিবিম্বের ধ্বংস হইলেও—কালান্তরে বা দেশান্তরে অবস্থিত হইলেও সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট বৃক্ষের স্বরূপটি বা ছায়াটি সংস্কার বলে অন্তঃকরণে পুনরুদিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম স্মৃতি বা স্মরণ। এই স্মরণাত্মক জ্ঞানের সহিত, প্রথমোৎপন্ন প্রমাজ্ঞানের প্রভেদ এই যে, স্মরণাত্মক জ্ঞান সংস্কার বলে উদিত হয়, আর প্রথমোৎপন্ন প্রমাজ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সমুৎপন্ন হয়। যাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয় তাহা সুস্পষ্ট, আর যাহা সংস্কার বলে দৃষ্ট হয়, তাহা অস্পষ্ট, যথা স্বপ্ন দর্শন। শক্তিবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের দৃষ্টি-বিজ্ঞান এইরূপ।

বৃত্তিবাদিদিগের মতও এইরূপ বটে, কিন্তু তাঁহারা দূরস্থ বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিম্বস্থান পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন। দৃষ্টান্ত দেখান, যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে [কাষ্ঠে বা প্রস্তরে] বিমর্দ্দ উপস্থিত হইলে তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নির আকার ধারণ করিয়া দূরে প্রসর্পিত হয়, সেই রূপ, কৃষ্ণসার যন্ত্র বিষ্টম্ভিত হইবা মাত্র তদনুগত আহঙ্কারিক অন্তঃকরণ বৃত্তিমান্ হয়, অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যেমন আয়ত হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায়, অন্তঃকরণও বিম্ব-স্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়। শক্তিবাদী সাংখ্য অপেক্ষা বৃত্তিবাদীর মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত, নচেৎ আর সকলই সমান। ফল, অন্তঃকরণের বিষয়াকার প্রাপ্ত হওয়া, আত্ম-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া, অনন্তর তাহা আত্মাতে প্রতিফলিত হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারকে সাংখ্য শাস্ত্রে প্রমা, প্রমিতি, জ্ঞান, বোধ, ফল, ইত্যাদি নানা নামে ব্যবহার হইয়া থাকে। পরন্তু চাক্ষুষ প্রমা বা চাক্ষুষজ্ঞান কথিত বিধ প্রণালী ক্রমেই সমুৎপন্ন হয়। উক্ত প্রণালীর কোন প্রকার ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটনা হইলে জ্ঞান জন্মে না। যদি জন্মে, তবে তাহা বিপর্য্যয় বা ভ্রম জ্ঞান। সেই বিপর্য্যয় জ্ঞানের নাম মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম, আরোপ, অজ্ঞান ও অবিদ্যা। কপিল ও কপিল মতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয় বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা তদপেক্ষা অনেক সংক্ষেপে বলিলাম। *

* "वृत्तिः सम्बन्धार्थं सर्पति" (কপিল) "यथा पार्थिवोपष्टम्भात् तदनुगता तैजसोऽग्निर्भवति एवमेव तत्तत्तेज आदि भूतोपष्टम्भेन तदनुगतादहङ्कारा-च्चक्षुरिन्द्रियाणि—" (ভাষ্য) "चक्षुरादिद्वारक बुद्धिवृत्तिश्च प्रदीपस्य शिखातुल्या बाह्यार्थसन्निकर्षानन्तरमेव तदाकारोल्लेखिनी भवति।" (ভাষ্য)

এস্থলে আরও দুই চারিটি সিদ্ধান্ত বাক্য বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ্য-আলোকের সাহায্য অপেক্ষা করে এবং বস্তুতে অভিব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব থাকা আবশ্যক। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন মলিন পদার্থ ব্যবধান না থাকা উচিত। বস্তুর সর্ব্ব শরীর প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, সম্মুখের অর্দ্ধ প্রত্যক্ষের বিষয়। অপরার্দ্ধ অনুমেয়। গোলক দুইটি হইলেও ইন্দ্রিয় একটি। অতি দূরত্ব প্রভৃতি নব বিধ প্রতিবন্ধক না থাকাও আবশ্যক। তদ্‌যথা—পক্ষী অতি দূরে উঠিলে প্রত্যক্ষ হয় না। লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতিসামীপ্য বশতঃ প্রত্যক্ষ হয় না। গোলক বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে প্রত্যক্ষ হয় না। বিমনা হইলেও উপলব্ধি হয় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত হয় বলিয়া দিবাতে গ্রহ নক্ষত্রের উপলব্ধি হয় না। স্বজাতীয় বস্তুদ্বয় একত্রিত হইলে, তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা অভিব্যক্ত হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব অতি-দূরত্ব, অতিসামীপ্য, ও ইন্দ্রিয় বা গোলকের অবহতি বা কোন প্রকার বিকার ঘটনা হওয়া, অমনোযোগ, অতিসূক্ষ্ম, অভিভব, সজাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনভিব্যক্তত্ব,—চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে *। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিবৃত্তিজনক এমত নহে, স্থল বিশেষে উহার কোন কোনটি বিপর্য্যয়েরও জনক হইয়া থাকে।

---

* "अतिदूरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्।
सौक्ष्म्यात् व्यवधानात् समानाभिहारा च ॥" (ঈশ্বরকৃষ্ণ)

এই রূপ শাস্ত্রের নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্ত্তা আছে। কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?—আদর্শে দর্শন কালে বস্তু বিপরীত ক্রমে দৃষ্ট হয় কেন?—নদী তীরস্থ বৃক্ষকে অধঃশির দেখা যায় কেন?—উপরিস্থ চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব জলের উপর ভাসমান না দেখাইয়া মধ্য-নিমগ্ন অর্থাৎ ডুবিয়া থাকার ন্যায় দেখা যায় কেন?—কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত স্থূল বস্তুর যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতেই বা ব্যতিক্রম আরম্ভ হয়, এই সকল বিষয় নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে থাকিলেও তাহা সাঙ্খ্যানুগত নহে বিবেচনায় পরিত্যাগ করা গেল।

আধ্যাসিকজ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

প্রমা-জ্ঞানের লক্ষণ বলা হইয়াছে। তৎসঙ্গে ভ্রম-জ্ঞানেরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আর তাহা বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। ফল, ভ্রমজ্ঞানের সাধারণ লক্ষণ এই যে, এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রম। ইহাই স্মরণ থাকিলে যথেষ্ট হইবে। অধ্যাস, আরোপ, অবিবেক-প্রভৃতি ইহার নামান্তর মাত্র।

দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং তাহার অবান্তর প্রভেদ প্রভৃতি যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণকার বক্তব্য। সাঙ্খ্য এবং বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান মিথ্যা হইলেও তাহার কোন না কোন ফল আছে। রজ্জু-সর্প দেখিলে তদনন্তর ভয় জন্মে, কম্পও জন্মে। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়া থাকে। যদ্যপি ভ্রম-মাত্রই মিথ্যা বা অসদ্বস্তু-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে কিন্তু

তাহা সর্ব্বত্র সমান নহে। ভিন্ন ভিন্ন ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন ফল ও প্রভাব দৃষ্ট হয়। সেই ফলভেদদৃষ্টে ভ্রম-জ্ঞানেরও শ্রেণী ভেদ কল্পনা করা যায়। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই প্রকার। অনন্তর উক্ত উভয় বিধের মধ্য হইতে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য, এই চারি প্রকার জাতি কল্পনা করা হইয়া থাকে।

সোপাধিক ভ্রম—যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধান বশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অন্যবস্তুতে মিথ্যা বা সত্য ভাবে সংক্রান্ত হয়,তাহা হইলে, যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে 'উপাধি,' আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে তাহাকে 'উপহিত' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গ বশতঃ একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্যপ্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম। স্ফটিক স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ; কিন্তু কখন কখন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধান বশতঃ উহা পীত বা লোহিত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেই প্রতীতি [স্ফটিক রক্তবর্ণ এই রূপ প্রতীতি] ভ্রম। তত্রত্য উপাধি (রঞ্জক বস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, "রক্তবর্ণ-স্ফটিক" এই জ্ঞান ভ্রম এবং তাহাই সোপাধিক-ভ্রম।

নিরুপাধিক ভ্রম—যে স্থল উক্ত কোন প্রকার উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান [বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার—জ্ঞান হয় অন্য প্রকার] হয়, সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যথা, নীল-আকাশ। বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ যেন প্রগাঢ় নীলবর্ণ বলিয়া বোধ হয়। অতএব আকাশে নীলিমা জ্ঞান ভ্রম এবং তাহা নিরুপাধিক-ভ্রম।

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম—ভ্রম-প্রবৃত্ত ব্যক্তি, অভীষ্ট লাভে বঞ্চিত হয় ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কখন কখন কাকতালীয় ন্যায়ে ভ্রম জ্ঞান সফল হইয়াও থাকে। যে স্থলে ভ্রম-জ্ঞানে ফল লাভ হয়, সেস্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী ভ্রম। আর যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সেস্থলের তাদৃশ ভ্রম বিসম্বাদী। এই বিসম্বাদী ভ্রমই প্রায়—সম্বাদী ভ্রম কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাস্পেতে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত-ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া, অগ্নি-আহরণার্থে উপস্থিত হইল এবং দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল। এমত স্থলে, ঐ ভ্রান্তব্যক্তির ধূম-ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার সেই ধূম ভ্রম বিসম্বাদী হইত।

আহার্য্য ও ঔপাধিক-আহার্য্য ভ্রম—যত্ন পূর্ব্বক এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম। যথা, মৃৎপিণ্ডে দেবতা বুদ্ধি [দেব দেবীর প্রতিমায় দেবত্ব বুদ্ধি সম্পাদন করিয়া পূজা করা] এবং রেখাতে অক্ষর বুদ্ধি। এই আহার্য্য-ভ্রমের জঠরে ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্ম। সাংখ্য শাস্ত্রের উপাসনা কাণ্ডও ইহার অধীন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য-ভ্রম যদি কোন উপাধি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহাকে ঔপাধিক-আহার্য্য বলে। যথা, চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র-প্রান্ত চাপিয়া দেখিলে, চন্দ্র দুই বা ততোধিক দেখা যায়। আকাশে মেঘ নাই, অথচ বিদ্যাবলে [ঐন্দ্রজালিক] তৎক্ষণাৎ সবিদ্যুৎ স্তনয়িত্নু দর্শন হইল। ক্ষুদ্রতম

অক্ষর বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচ-বিশেষের সংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা, ইত্যাদি নানা প্রকার ঔপাধিক আহার্য্যের উদাহরণ স্থল আছে। কি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান, কি ঔপদেশিক জ্ঞান,—সর্ব্ব প্রকার জ্ঞানের অন্তরালে উক্ত প্রকার শত শত ভ্রম লুক্কায়িত আছে। তত্তাবতের নিবৃত্তি না হইলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা করা যাইতে পারে না।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটি। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার বা স্মরণ।

দোষ—দোষ নানা প্রকার। নিমিত্তগত দোষ, কালগত দোষ ও দেশগত দোষ। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় কোন প্রকার দুষ্টপদার্থে কলুষিত থাকা। চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষুঃ যদি পিত্ত দোষে বিকৃত হয়, তবে অতিশ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি কাল দোষ। অতিদূরত্ব অতিসামিপ্য প্রভৃতি, দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ,—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে; যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি না হওয়া, অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশ মাত্রের প্রকাশ পাওয়া।

সংস্কার,—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যকেই ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণনা আছে। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মিতে পারে না।

রজ্জুতে সর্প ভ্রমই জন্মে, ব্যাঘ্র ভ্রম জন্মে না ; অতএব কোন প্রকার সাদৃশ্যবান্ বস্তুতেই দোষ বা সম্প্রয়োগ উপস্থিত হইলে ভ্রম জন্মে।

মনে কর, যেন একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে। তন্মধ্য হইতে হটাৎ একব্যক্তি 'ঐ রৌপ্য' বলিয়া ধাবিত হইল। অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্য দৌড়িয়াছে তাহা রূপা নহে, তাহা শুক্তিখণ্ড। ভ্রান্তব্যক্তিও তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিল, সে যাহাকে রৌপ্য ভাবিয়াছিল তাহা রৌপ্য নহে তাহা শুক্তিখণ্ড। এস্থলের ভ্রান্তব্যক্তির যে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হইয়াছে, ইহাকে দৃষ্টান্ত রাখিয়া ভ্রমজ্ঞানের কার্য্য-কারণ ভাব পরিষ্কার করিয়া লও। যথা—যৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে 'ঐ রজত' ইত্যাকার জ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন তাহার ঐ সমুদিত জ্ঞান একেবারে হয় নাই। চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর "ঐ" এই অংশের দ্বারা পুরোবর্ত্তী শুক্তিই পরিগৃহীত হইয়াছিল, তৎপ্রভাবে "ঐ" ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য নির্গত হইয়াছিল।* কিন্তু কোন প্রকার দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়াতে অর্থাৎ শুক্তির সর্ব্বাংশ প্রকাশ না হওয়াতে প্রথমে তাহা শুক্তি বলিয়া জ্ঞান হয় নাই। পরন্তু চাকৃচিক্য মাত্র ভান হওয়াতেই ঐ কথা বাহির হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন অন্য এক চাক্‌চিক্যবান্ বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজতের স্মরণ হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্‌রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া, "ঐ" ইত্যাকার সম্মুখ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া "ঐ—রজত" ইত্যাকারে পরিণত হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান "ঐ" ইত্যাকার সম্মুখ জ্ঞানের সহিত মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞান মাত্রেই বস্তুর সমস্ত বিশেষণ অবগাহন করিয়া পরিশেষে বিশেষ্যে পর্য্যবসিত না হইয়া থাকিতে পারে না। শুক্তি-রজত, এস্থলেও

জ্ঞান, চাক্‌চিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া তৎকালে প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতেই অন্য এক কল্পিত বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসন্ন হইয়াছিল। এক বস্তুর বিশেষণ অর্থাৎ আকার প্রকার যদি অন্য বস্তুতে দৃষ্ট হয়, তবে সেই দেখা মিথ্যা সুতরাং শুক্তিরূপ অধিকরণে রজতাকার জ্ঞানও মিথ্যা। আহার্য্যভ্রম ব্যতিরেকে, সকল ভ্রমেরই প্রণালী এইরূপ। এই প্রণালী অনুসারে সর্ব্বত্রই এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল তাহার আলম্বন পদার্থের সাক্ষাৎকার করা। যাবৎ না তাহার আলম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ প্রকাশ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার বাধ (বিলয়) হয় না। সাংখ্যমতে এইরূপ ভ্রম-প্রণালীর নাম অন্যথা-খ্যাতি। অন্যান্য দার্শনিকদিগের ভ্রম প্রণালী অন্যবিধ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির প্রধান কারণ অজ্ঞান। অজ্ঞান যে কি পদার্থ?—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা যায় না। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে তাহা অনির্ব্বচনীয় এবং দোষ-স্থানীয়। দোষ-যুক্ত অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ যদি কোন গতিকে একবার তাহার অধিকার ভুক্ত হয়, তবে সে, সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবে অর্থাৎ দেখাইবে। পূর্ব্বোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় হওয়াতেই সে তাহাতে এক মিথ্যা-রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে এইরূপ স্বভাব এমত নহে; দোষযুক্ত বস্তু মাত্রই বিপরীত সৃষ্টিকারী। বেত্র বীজ অগ্নিজুষ্ট হইলে বেত্রাঙ্কুরের উৎপত্তি না করিয়া, কদলী বৃক্ষের উৎপত্তি করে। মক্ষিকামল, বিশিষ্টবিকারের বলে 'পুদিনা' শাকের

সৃষ্টি করে। এইরূপে পলাণ্ডুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং কত শত নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান মাত্রেই সত্য অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যা জ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। তবে যে শুক্তি স্বরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, তাহা বাল-প্রবাদ মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তি জ্ঞানই হইয়াছিল, রজতাকার জ্ঞান রজতেই হইয়াছিল। দোষ বশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়াতেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য অনুভব না হওয়ার নামই ভ্রম, এতদ্ভিন্ন মিথ্যাবস্তু-অবগাহী মিথ্যা জ্ঞানাত্মক ভ্রম এ জগতে নাই।

যাহাই হউক, উক্ত-বিধ অধ্যাসের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতা আছে। তত্তাবৎ বিস্তার করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হয় এবং সাংখ্য অধিকারের বাহিরে যাইতে হয়। যদ্যপি তাহা আমাদের ইষ্ট নহে, তথাপি আর একটু না বলিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না সুতরাং তাহার কিয়দংশ বলিতে হইল।

অধ্যাসের আর দুইটী মূর্ত্তি আছে। একটীর নাম তাদাত্ম্যাধ্যাস, অপরটীর নাম সংসর্গাধ্যাস। একীভূত অধ্যাসকে তাদাত্ম্যাধ্যাস, আর সম্বন্ধ মাত্রের অধ্যাসকে সংসর্গাধ্যাস বলা যায়। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইলে লৌহেতে যে অগ্নির অধ্যাস জন্মে, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে যে জীব 'আমি গেলাম—আমি মরিলাম' বলিয়া অভিভূত হয়, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। "আমার পুত্র" "আমার কলত্র" ইত্যাদিস্থলে

পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্ম-সম্বন্ধ অধ্যাস করা হয় সুতরাং তাহা সংসর্গাধ্যাসের ফল। যত প্রকার অধ্যাস উক্ত হইল, সর্ব্বপ্রকার অধ্যাসই বাহ্যপদার্থের ন্যায় অধ্যাত্ম-পদার্থে বর্ত্তমান আছে। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া 'আমি' হইতেছি। যথা আমি কাণা, আমি খঞ্জ ইত্যাদি। কখন বা দেহের উপর আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি। যথা আমি কৃশ, আমি স্থূল ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত আমি কি প্রকার?—তাহা আমরা অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম—তাহা হইলে 'আমি'-ব্যবহার আজীবন একরূপেই চলিত; কিন্তু তাহা চলে না। আমরা একবার যাহাকে লক্ষ্য করিয়া "আমি" বলিতেছি, অন্যবার তাহাকেই আবার "আমার" বলিতেছি। প্রকৃত 'আমি' স্থির থাকিলে এরূপ ঘটনা কখনই হইত না, দুঃখেরও লাঘব হইত। বিবেচনা করিয়া দেখ—যদি কোন ইন্দ্রিয়কে আমি বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত থাকে, তাহা হইলে শরীরের দোষাদোষে "আমি" লিপ্ত হইব কেন? অতএব যাহা প্রকৃত আমি, তাহার সহিত 'আমি'-ভিন্ন অবশ্য অন্য কোন বস্তুর অধ্যাস আছে স্বীকার করিতে হইবে। সেই অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধ মাত্র প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে বাহ্য জগতে ও আত্ম-রাজ্যে কথিতবিধ অধ্যাস ধারাবাহীক্রমে চলিতেছে। পরন্তু কারণ বিশেষ উপস্থিত হইলে কখন কখন বাহ্য অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় কিন্তু আধ্যাত্মিক অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না।

অধ্যাস বা ভ্রমনিবৃত্তির উপায় কি? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা বলেন, ভ্রমনিবৃত্তির উপায় কেবল অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকার।

যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয়, তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইবার উপায় কেবল বিশেষ দর্শন। 'বিশেষদর্শন' শব্দের অর্থ স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কোথাও বা বারংবার দর্শন—কোথাও বা উপযুক্ত পরীক্ষাপ্রয়োগ। যাহার দ্বারা দোষ ও সম্প্রয়োগ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় তাহারই নাম পরীক্ষা। তাদৃশ পরীক্ষার প্রয়োগ করিলেই দোষাদি হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায় ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না?— তাহার আর পরীক্ষা করিতে হয় না; কেন না, যথার্থজ্ঞান উপস্থিত হইলে সেই জ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং অবিচলিত বিশ্বাস জন্মাইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে। অপিচ, অধ্যাস নিবৃত্তি ঘটিত আরও গুটি কতক নিয়ম দৃষ্ট হয়; যথা —অপরোক্ষ অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম, যুক্তি বা উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিত ভ্রমে, বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শত শত উপদেশ ও শত শত যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তাহার দিগ্‌ভ্রান্তি নিবৃত্তি হয় না। মনে কর, কোন এক নূতন স্থানে গিয়া কোন এক ব্যক্তির পূর্ব্বদিকে পশ্চিম দিক্ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে। সে জানে যে পূর্ব্ব দিক্ হইতেই সূর্য্য উদিত হন, তথাপি, সূর্য্যকে যে দিকে উদিত হইতে দেখিতেছে সেই দিকই তাহার পশ্চিম বলিয়া বোধ হইতেছে। এমন স্থলে 'সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হন না,' এই যুক্তি কোন কার্য্যকারী হয় না। যাবৎ না সেইদিক্ তাহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়, তাবৎ তাহার সেই ভ্রম অপগত হয় না। এই রূপ, ঔপদেশিকজ্ঞানে ভ্রম থাকিলে কদাচিৎ তাহা যুক্তিদ্বারা বাধিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে যে ভ্রম থাকে তাহা সাক্ষাৎকার ব্যতীত

উপদেশ দ্বারা বাধিত হয় না। এতাবতা ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, সাক্ষাৎকার ঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক-ভ্রম অনেক আছে, তত্তাবৎ উপরোক্ত প্রণালীতেই জন্মিয়া আছে। সেই সকল ভ্রমনিবৃত্তির জন্য, সাংখ্য শাস্ত্রে এবং শাস্ত্রান্তরে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ করা হইয়াছে। কেন না, অনাদিকালের আধ্যাত্মিক-ভ্রম নিবৃত্ত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ, এই তিন জাতীয় পরীক্ষারই আবশ্যক হইতে পারে। একটি দ্বারা উক্ত বিধ আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন, এই দুইটি যুক্তি ও উপদেশ জাতীয়, নিদিধ্যাসন-টি প্রত্যক্ষ জাতীয়। "প্রত্যক্ষ জাতীয়" এই কথায় ভ্রান্ত-জীব মাত্রে আত্মার প্রত্যক্ষ বিষয়ে সংশয় করিবেন। সে সংশয় উচ্ছেদ করা বাক্যের বা শাস্ত্রের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাতে সংশয়িত ব্যক্তির যোগ বল থাকা আবশ্যক। ফল, চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না বটে, কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে আত্মা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়। সাঙ্খ্যকার বলেন, কোন কোন বস্তু কেবলমাত্র মনের দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সংস্কৃতশাস্ত্রে চাক্ষুষ-জ্ঞান-ঘটিত বিচার এতদপেক্ষা বিস্তৃত থাকিলেও আমরা এই স্থানে শেষ করিলাম।*

শ্রবণেন্দ্রিয় ও শ্রবণজ্ঞান।

চক্ষুঃ কেবল রূপেতেই সংসক্ত, সুতরাং চক্ষুর্দ্বারা রূপ বা রূপ-বিশিষ্ট পদার্থেরই গ্রহ হয়, শব্দ-স্পর্শাদির গ্রহ হয় না। শব্দাদি

---

* "নিয়তকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" "যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে, দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে" এই কাপিল সূত্র দ্বয়ের মর্ম্ম এবং অন্যান্য আচার্য্যদিগের মত লইয়া অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় ঘটিত বাক্য গুলি সংকলিত হইল।

জ্ঞানের নিমিত্ত আর চারিটি ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে শব্দ-গ্রহণ-কারী শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় অগ্রে বর্ণন করা যাউক—

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও প্রত্যক্ষের অগোচর বস্তু। কেবল অনুমিতি দ্বারাই উহার উপলব্ধি ও অস্তিত্ব সিদ্ধি হয়। উহার আশ্রয় কর্ণান্তঃপ্রদেশ। শঙ্খ-গল-গহ্বরের রচনা পরিপাটী যেরূপ, শ্রবণযন্ত্রের রচনাপরিপাটীও প্রায় সেই রূপ। কর্ণের অন্তরাল প্রদেশের যে স্থলে বক্র ও আবর্ত্তযুক্ত ছিদ্রের সমাপ্তি হইয়াছে, সেই স্থলে এক স্থিতিস্থাপক-গুণযুক্ত সূক্ষ্ম স্নায়ু-মণ্ডল [সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নৈহিক শিরাগ্রন্থি] আছে। এক খণ্ড সূচীন ত্বক্ উহাকে আবরণ করিয়া আছে। ঐ আবরক ত্বক্ খণ্ডের নাম শষ্কুলি। এই শষ্কুলিস্থানে যে অবকাশ (ফাক্) আছে, তাহার নাম শ্রোত্রাকাশ। ইহাই ন্যায় মতের শ্রবণে-ন্দ্রিয়, কিন্তু সাংখ্য মতে উহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোলক। শ্রবণেন্দ্রিয় ঐ শষ্কুলিস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কার্য্য সাধন করিতেছে। সাংখ্যমতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়ও আহঙ্কারিক *। শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রণালী কি রূপ?—সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহা কিছু বিশেষ করিয়া বলেন নাই। শাস্ত্রান্তরে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাকে নিন্দাও করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, শাস্ত্রান্তরোক্ত প্রণালীই সাংখ্যকারের অভিমত †। শাস্ত্রান্তরে বিবিধ প্রণালীর বর্ণনা

---

* "কর্ণ-শষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রম্" এই বাক্য দ্বারা ন্যায় মতে শ্রব-ণেন্দ্রিয় ভৌতিক হইতেছে, আর "সাত্ত্বিকমেকাদশক-মপরঞ্চ" এই বাক্য দ্বারা সাংখ্যকার উহাকে আহঙ্কারিক বলিতেছেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্ব যে প্রকারে অনুভব করিতে হইয়াছে—শ্রবণেন্দ্রিয়ের আহঙ্কারিকত্বও সেই প্রকারে বোধগম্য করিতে হইবে।

† "[illegible]" কোন

আছে। তন্মধ্যে একপ্রকার প্রণালী বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ানুসারিণী—অপর প্রণালী কদম্বগোলক-ন্যায়ানুসারিণী। বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ানুসারিণী যথা,—

কোন এক স্থিরজল-জলাশয়ের মধ্যে, কোন প্রকার অভিঘাত উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য, তত্রস্থ জলে একপ্রকার বেগের উৎপত্তি হয়। ক্রমে, সেই বেগ হইতে বেগান্তর—ও তরঙ্গ হইতে তরঙ্গান্তর জন্মিতে জন্মিতে, বীচি অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা লহরীর আকার প্রাপ্ত হয়। ক্রমে অতি ক্ষুদ্র, ক্রমে বিলয়। যদি মধ্যে কোথাও বেগ নিরোধক বস্তু [কূল বা অন্য কোন প্রকার] থাকে। তবে তাহা সেই স্থানেই নষ্ট হয়, নচেৎ তাহা দূরে গিয়া বিলয় হয়। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি বায়ু পরিব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের যে কোন স্থানে হউক না কেন, কোন প্রকার অভিঘাত (এক বস্তুতে অন্য এক বস্তুর আঘাত অর্থাৎ বেগ পূর্ব্বক সংযোগ) উপস্থিত হইলে, তত্রত্য বায়ুতে এক প্রকার বেগ জন্মে। ঐ বেগ কি করে? না আঘাত স্থানটিকে বেষ্টন করিয়া তত্রত্য বায়ুকে তরঙ্গায়িত করে। আঘাত কালে যেমন বায়ুতে বেগ জন্মিয়াছিল, তেমনি আকাশে ধ্বনি [শব্দ] জন্মিয়াছিল। সেই ধ্বনি ঐ তরঙ্গায়মান বায়ুতে আরোহণ করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রিয় তাহাকে গ্রহণ করিয়া আত্মার নিকট সমর্পণ করে। যদ্যপি ইন্দ্রিয় নিকটে না থাকে, তবে সেই আকাশোৎপন্ন শব্দটি

এক শাস্ত্রে কোন এক বিষয়ের নির্ণয় করা হয় নাই, কিন্তু তাহা অন্য শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, এমত স্থলে সেই অনুক্তবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, তৎ সজাতীয় শাস্ত্রে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিবে, কেন না, তাহাই তাহার সম্মত।

আপনার উৎপত্তি স্থানে অর্থাৎ আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়। অপিচ, স্থিরজল জলাশয়ের মধ্যে আঘাত করিলে যে তদুত্থ তরঙ্গ কদাচিৎ তীর স্পর্শ করে, কদাচিৎ নাও করে,তাহার কারণ কেবল আঘাত-বল বা আঘাত জন্য বেগের তারতম্য ঘটনা। বেগ অধিক পরিমাণে জন্মিলে তরঙ্গের দূর গতি—আর অল্প পরিমাণে জন্মিলে অদূর-গতি হইয়া থাকে। শব্দের গতিও ঠিক্ ঐরূপ, অর্থাৎ যে পরিমাণে বেগ উপস্থিত হইবে—শব্দের গতিও সেই পরিমাণে হইবে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা এই রূপে [বীচিতরঙ্গের দৃষ্টান্তে] শ্রবণেন্দ্রিয়ের শব্দ গ্রহণ প্রকার নির্ণয় করেন। এই নির্ণয়ের অনুসারে দার্শনিকেরা নিম্ন প্রকটিত ঘটনা গুলিকে সোপপত্তিক বিবেচনা করেন। যথা,—

"শব্দ বহন কারী বায়ুর বিপরীত গতি প্রবল থাকিলে নিকটোৎপন্ন শব্দও যথাবৎ গৃহীত হইবে না"—"সাম্মুখ্য থাকিলে দূরোৎপন্ন শব্দও নিকটের ন্যায় শুনা যাইবে"—"শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘাত স্থান, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বায়ুর বেগ রোধক বস্তু ব্যবধান থাকিলে শুনা যাইবে না, বা অল্প শুনা যাইবে"—"পার্থিব প্রদেশের দূরত্ব যে পরিমাণে শব্দ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, জলময় প্রদেশে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে প্রতিবন্ধক হইবে,এমন কি,পার্থিব প্রদেশের অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব—আর জলময় প্রদেশের এক ক্রোশ পরিমিত দূরত্ব সমান; কারণ, জলময় প্রদেশের বায়ুতে স্বভাবতই বেগ থাকে"—"শব্দ উত্থিত হইবামাত্র তরঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হয় বলিয়া চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা শুনিতে পায়"—"দিন অপেক্ষা মধ্যরাত্রে অধিক দূরের শব্দ শ্রবণ গোচর হয়, তাহার কারণ, তৎকালে অভিভাবক শব্দান্তর থাকে না এবং মধ্য রাত্রের বায়ুতে স্বভাবতঃই বেগ থাকে"—ইত্যাদি—

বীচিতরঙ্গ ন্যায়-বাদীর মত, আর কদম্বগোলক ন্যায়-বাদীর মত প্রায় এক রূপ। প্রভেদ এই যে, বীচিতরঙ্গ বাদী বলেন, শব্দ একটিই জন্মে—আর কদম্বগোলক ন্যায়-বাদী বলেন, কদম্বকেশরের ন্যায় তদুপরি তদুপরি নানা শব্দ জন্মে। অর্থাৎ কদম্বকুসুমের কিঞ্জল্কারোহণ স্থান বর্ত্তুল, সেই বর্ত্তুল অংশের সর্ব্ব দিক্ ব্যাপিয়া যেমন এক থাকে অনেক কেশর জন্মে, সেই সকল কেশরের শিরঃ-প্রদেশে আবার কেশরান্তর জন্মে, শব্দও ঐরূপ আঘাত স্থান হইতে এককালে দশ দিক্ অভিমুখে দশ সংখ্যায় জন্ম লাভ করে। সেই দশ শব্দ হইতে অন্য দশ শব্দ জন্মে, ক্রমে অন্য দশ শব্দ, ক্রমে ইন্দ্রিয় স্থান প্রাপ্তি *।

---

* উক্ত উভয় মতেই শব্দ অভিঘাত স্থানে উৎপন্ন হইয়া, ইন্দ্রিয় স্থানে গিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আর এক মত আছে, সে মতে শব্দ আঘাত স্থানে উৎপন্ন হয় না। আঘাত স্থলে কেবল বেগ জন্মে। ঐ বেগ, শ্রোত্র স্থান প্রাপ্ত হইলে তথায় গিয়া শব্দ উৎপন্ন করে এবং তাহাই ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। যথা,—"যন্ত্রস্তু শ্রীতীন্দ্রিয়: শ্রবণেন্দ্রিয়েণ গৃহ্যতে (ন্যায়গ্রন্থ) গ্রন্থিহীন বংশ খণ্ডের এক দিকে লূতা নির্ম্মোক (মাকড়শার ডিমের ত্বক্) বা আলক-পত্রের ত্বক্ দ্বারা আবৃত করিয়া, অপর দিকে ফুৎকার প্রদান করিলে যে তন্মধ্যে বেগ উপস্থিত হয়, সেই বেগ ঐ আবরণত্বককে গিয়া আঘাত করে এবং সেই আঘাত হইতেই তাহাতে শব্দ জন্মে। এই দৃষ্টান্ত উভয় বাদীরাই দিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় পক্ষের সংগতি যে কি প্রকার, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি না। যাহাই হউক, কর্ণ-শষ্কুলি ঐ যন্ত্রের তুল্য কার্য্যকারী বটে। অপর এক মত আছে যে, শব্দ ইন্দ্রিয় স্থানে গমন করে না, ইন্দ্রিয়ই শব্দ স্থানে গিয়া গ্রহণ করে। যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয় প্রদেশে যায়, শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ শব্দ স্থানে যায়। বলেন, "ভেরীশব্দো ময়া শ্রুতঃ" "আমি ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি।" ভেরী ধ্বনি শুনিয়া মনুষ্যাদিগের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। শব্দ স্থানে ইন্দ্রিয়ের গতি না হইলে এপ্রকার অনুভব হইবে কেন? ভেরীতে যে শব্দোৎপত্তি হইয়াছিল, বীচিতরঙ্গ বাদীর মতে সে শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ

বীচিতরঙ্গ ও কদম্ব গোলক, এই দুই দৃষ্টান্ত প্রদায়ী আচার্য্য-দ্বয়ের মতে শব্দ ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। এমন কি, শব্দ তিন্ ক্ষণের অতি-রিক্ত থাকে না। সুতরাং বায়ুর দূরগামী বেগ সত্ত্বেও সে আপনার বিনাশ কাল উপস্থিত হওয়াতে বিনষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য আমরা দেশান্তরের শব্দ শুনিতে পাই না। তবে যে আমরা প্রহরব্যাপী বংশী নিনাদ শুনিয়া থাকি, সে একটি শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা, অর্থাৎ তাহা বহুল শব্দের সমষ্টি। শব্দ উৎপন্ন হইতেছে—ধ্বংস হইতেছে—এবং তাহা এত শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইতেছে যে তাহার বিচ্ছেদকাল লক্ষ্য হয়না সুতরাং সেই ধারাবাহিক সুসংলগ্ন শব্দশ্রেণীকে আমরা একটি শব্দ বিবেচনা করি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা একটি শব্দ নহে। তাহা শব্দধারা। অপিচ, উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা আর একটি সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, যে ত্রিক্ষণ শব্দের জীবন, সেই ত্রিক্ষণের মধ্যে শব্দ, বেগ-অনুসারে ক্রোশান্তে চালিত হইতে পারে, আবার অর্দ্ধ ক্রোশ যাইতেও পারে না। দূর গমন কালে শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতেই যায়; কেন না, ক্ষীণতা-ব্যতিরেকে কোন বস্তুই ধ্বংস হয় না। সুতরাং বেগের আধিক্য হইলে সেই তিন ক্ষণের মধ্যে শব্দ অধিক দূরে যাইতে পারে, আর বেগের অল্পতা থাকিলে অধিক দূর

হয় নাই। সেই শব্দ-জন্য শব্দান্তরের সহিতই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং "ভেরীর শব্দ শুনিয়াছি" এরূপ অনুভব না হইয়া "ভেরীশব্দের শব্দ—তজ্জন্য শব্দ শুনিয়াছি" এইরূপ অনুভবই হইত। যখন তাহা হয় না, তখন শব্দ যে ইন্দ্রিয় স্থানে যায়, তাহা আর অস্বীকার করা যায় না। এই রূপ শব্দ বিজ্ঞান ঘটিত অনেক বিতর্ক আছে, সিদ্ধান্তও আছে, কিন্তু যথার্থ সিদ্ধান্ত কি ! তাহা তাঁহারাই জানেন।

যাইতে পারে না। সেই তিন ক্ষণের মধ্যে যত দূর যাওয়া সম্ভব—তত দূর গিয়া বিলয় হয়। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়, তবে এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, এমন এক প্রকার শব্দ আছে যে, সে শব্দ, ক্ষীণ না হইয়া বরং নিকট অপেক্ষা দূরে গিয়া পুষ্ট হয়, [যথা কামানের শব্দ] তাহা হয় কেন?—

ইহার উত্তর এই যে, যে শব্দের প্রতিধ্বনি জন্মে, সেই শব্দই দূরে গিয়া স্থূলতা বোধ করায়। কিন্তু সে স্থূলতা বাস্তবিক মূল শব্দের নহে। বিবেচনা কর, ধ্বনি-জন্য ধ্বনির নাম প্রতিধ্বনি। সুতরাং দ্বিতীয়-ক্ষণ ব্যতিরেকে প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ সম্ভবে না। যদি দ্বিতীয় ক্ষণেই প্রতিধ্বনির জন্ম লাভ হইল, তবে এক অতিরিক্ত-ক্ষণ ব্যাপিয়া মূল শব্দের গতি পাওয়া গেল এবং সেই দ্বিতীয় ক্ষণে যুগপৎ ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি উভয়ই মিলিত হইয়া তত্রত্য মনুষ্যের শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সুতরাং সেই বিমিশ্র শব্দটি নিকট অপেক্ষা দূরস্থ মনুষ্যের নিকট স্থূল বোধ হইয়া থাকে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উভয়ের ভেদ জ্ঞান না হওয়াই ঐ স্থূলত্ব বোধের কারণ। প্রতিধ্বনি পদার্থ কি?—এবং কিজন্য উহা জন্মে?—আবশ্যক হইলে সে সমস্ত স্বতন্ত্র স্থানে বলা যাইবে।

স্পর্শ ও স্পর্শগ্রাহক ত্বগিন্দ্রিয়।

এই ইন্দ্রিয় দ্বারা শীত, উষ্ণ, খর, তীব্র প্রভৃতি নানা জাতীয় স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। দ্রব্য ও ত্বক্, এতদুভয়ের সংযোগ হইবামাত্র ত্বগিন্দ্রিয়, দ্রব্যগত-শীতলত্বাদি গুণ সমূহকে গ্রহণ করতঃ মনের সাহায্যে আত্মাতে তত্তৎ জ্ঞানের উৎপাদন করে। "আত্মাতে জ্ঞান উৎপাদন করে" একথা ন্যায় সম্মত। সাঙ্খ্যমত এই যে, আত্মা স্বতঃই জ্ঞান

স্বরূপ, সুতরাং তাহার উৎপত্তি, বিনাশ বা বিকার নাই। আত্মা ব্যতীত সমস্ত পদার্থই আত্মার ভোগ্য এবং সমস্তই আত্মার ভোগ জন্মায়। অন্যে যাহাকে বলে 'জ্ঞান হয়'—সাঙ্খ্য তাহাকে বলেন 'ভোগ হয়'। ভোগ হওয়া কি না 'জ্ঞান হওয়া'—জ্ঞান হওয়া কি না 'ভোগ হওয়া' বস্তু সকলের ভাব বা ছবি ইন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধিতে আবদ্ধ হওয়ার নাম বৃত্তি এবং তাহা বুদ্ধির অতিসন্নিকৃষ্ট আত্মায় প্রতিবিম্বিত হওয়াই ভোগ ও জ্ঞান। দ্রুত বা গালিত সুবর্ণ মূষায় [ছাঁচে] ঢালিবামাত্র তাহা যেমন মূষার অনুরূপ রূপবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়সম্বদ্ধ বস্তুর ন্যায় আকার ধারণ করে। অতএব বস্তু সকল মূষা স্থানীয়, আর বুদ্ধি, গলিত সুবর্ণের স্থানীয়। ত্বকে দ্রব্য-সংযোগ হইলেই ত্বক্ দ্রব্যগত সমস্ত গুণকেই গ্রহণ করে বটে, কিন্তু কোমলত্ব ও কঠিনত্ব, এই দুইটি গুণের গ্রহণ পক্ষে কিঞ্চিৎ বিশেষ সংযোগ অপেক্ষা করে। সামান্য সংযোগ দ্বারা কোমলত্ব কঠিনত্বের গ্রহ হয় না। দৃঢ়তর সংযোগ অর্থাৎ যাহাকে চাপা বলে, তাদৃশ সংযোগই তদুভয়ের গ্রাহক। এই চাপা রূপ দৈহিক কার্য্য-টি আত্মার প্রযত্ন বলেই সম্পাদিত হয়, তন্নিমিত্ত আর স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় কল্পনা করিতে হয় না *।

ত্বগিন্দ্রিয়ের আশ্রয় স্থান ত্বক্ অর্থাৎ চর্ম্ম বিশেষ। দৃশ্যমান বাহ্যচর্ম্ম প্রকৃত ত্বক্ নহে। যদি দৃশ্যমান চর্ম্মই প্রকৃত ত্বক্ হইত, তাহা হইলে, মাত্র বাহ্য-শীতলত্বাদিরই অনুভব হইত, বেদনাদি আন্তর-

---

* "কঠিনত্বাদিস্বধর্মমিষ্টে সংযোগবিশেষঃ কারণম্" [বৌদ্ধ] ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা পরিমাণাদি গ্রহণ পক্ষেও সংযোগ বিশেষের আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন গুণ গুলি গৃহীত হয়, এক প্রকার সংযোগ বহুপ্রকার গুণের গ্রাহক নহে।

স্পর্শের অনুভব হইত না। অতএব, ত্বগিন্দ্রিয় যে কেবল বাহ্য চর্ম্ম ব্যাপক এমত নহে; ইহা আপাদ মস্তক সমস্ত দেহ পরিব্যাপ্ত। এই ত্বক্‌গোলকের আকার কিরূপ?—সহজবোধ্য নহে। কেবল কল্পনা দ্বারা ইহার আকার সংগ্রহ করিতে হয়। সে কল্পনা এইরূপ—

মাংসময় প্রাণি-দেহ কেবল সূক্ষ্ম-শিরাসমষ্টির জমাট্ মাত্র। আমরা যাহাকে এক্ষণে মাংস বলিয়া ব্যবহার করিতেছি, তাহাও শিরার সমষ্টি। আলুর পাতা কিম্বা অশ্বত্থ পত্র পচিয়া তাহার পার্থিবাংশ নির্গলিত হইয়া গেলে, পাতাটি যেমন কেবল মাত্র তন্তুময় হইয়া থাকে, প্রাণি-শরীরও ঠিক্ সেইরূপ পদার্থে আবৃত আছে এবং তাহাই ত্বগিন্দ্রিয়ের গোলক। এই ত্বগিন্দ্রিয় সমস্ত শরীর-ব্যাপী, তজ্জন্য বাহ্য স্পর্শের ন্যায় আন্তর স্পর্শও যথাযথ অনুভূত হইয়া থাকে।

রসনা ও রাসন-জ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টি কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি রসানুভবের দ্বার স্বরূপ। রসনা দ্বারা যে বস্তুনিষ্ঠ রসের প্রত্যক্ষ [অনুভব] হয়, তাহাকে রাসন-প্রত্যক্ষ বলে [রসানুভব, রস জ্ঞান ও রাসন প্রত্যক্ষ, একপর্য্যায় শব্দ] এই রাসন-প্রত্যক্ষবিষয়েও পূর্ব্ববৎ দ্রব্য ও রসনেন্দ্রিয়ের সংযোগ অপেক্ষা করে। রসনেন্দ্রিয়ের গোলক অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান জিহ্বা। এ স্থলে জিহ্বাঁর আভ্যন্তরীণ তথ্য প্রকট করা অনাবশ্যক, উহা বৈদ্যক গ্রন্থে অনুসন্ধেয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও গন্ধজ্ঞান।

এই ইন্দ্রিয়টি ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ জ্ঞানের হেতু। নাসা-দণ্ডের অভ্যন্তর মূল ইহার স্থান। গন্ধ, বায়ু কর্তৃক আনীত হইয়া ইন্দ্রিয়

স্থানে সংযুক্ত হইলে পর তদুভয়ের সংযোগ বশতঃ গন্ধানুভব হইয়া থাকে। এইরূপে চক্ষু হইতে ঘ্রাণ পর্য্যন্ত কথিত প্রকারের পাঁচটি ইন্দ্রিয়, জ্ঞানের জনক বলিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত। এক্ষণে কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পাদক ইন্দ্রিয়ের বিষয় লিখিত হইবে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্, হস্ত,পাদ, পায়ু, উপস্থ ;—এই পাঁচটিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বসে। সাংখ্য মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই তুইটি মাত্র মানব দেহের প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ তদুভয় ব্যতিরেকে প্রাণিগণের অপর কোন কার্য্য দৃষ্ট হয় না। চক্ষুরাদি যেমন জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়—তাহারা যেমন যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া স্পৃষ্ট পদার্থের উপর জ্ঞান ব্যবহার রক্ষা করতঃ অবস্থিত আছে—এইরূপ 'বাক্' প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিও যথোপযুক্ত স্থানে থাকিয়া ক্রিয়া বা কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ অবস্থিত আছে। বাক্-ইন্দ্রিয় দ্বারা বাক্‌নিষ্পত্তি—হস্তেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ কর্ম্ম—পাদ দ্বারা বিহরণ (গমনাদি)—পায়ু দ্বারা বিসর্গ (মল মূত্রাদির ত্যাগ)—উপস্থ দ্বারা আনন্দ বিশেষ সম্পন্ন হইতেছে। ইহ জগতে প্রাণিগণের যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন অপর কিছু সম্পাদ্য নাই, তেমনি, তদুভয়ের সাধক দশটি ভিন্ন একাদশটি ইন্দ্রিয় নাই, একথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ; এজন্য কপিল এগারটি (১১) ইন্দ্রিয়ের কথা বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টি মনঃ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে বিশেষ বিচার্য্য কিছুই নাই—এজন্য তত্তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পক্ষ বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব।

কপিল বলেন, মনঃ ইন্দ্রিয়ও বটে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষও

বটে। অনেকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সেশ্বর নিরীশ্বর উভয়বিধ সাংখ্যেই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার আছে। এমন কি, মনঃ প্রধান ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণিত আছে *।

সাংখ্যাচার্য্যেরা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার-কারিদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন যে, "শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস প্রভৃতি বাহ্য বস্তুর ধর্ম্ম গুলি যেন পঞ্চবিধ বাহ্য করণের [বাহ্যেন্দ্রিয়ের] দ্বারা গৃহীত হইল, কিন্তু সুখ,দুঃখ,যত্ন প্রভৃতি আন্তর ধর্ম্ম গুলির গৃহীতা কে ?—বাহ্যপদার্থের সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত যেমন বাহ্যকরণ আবশ্যক, তেমনি অন্তঃপদার্থ সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত অন্তঃকরণও আবশ্যক। সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকার সর্ব্বদাই হইতেছে, সুতরাং তাহার অপলাপ করিতে পারিবে না অথচ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক,—কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় বলিতে পারিবে না ; সুতরাং, মনঃ যে সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকারের একমাত্র দ্বার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও তোমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি তাহাই হইল,তবে আর মনের ইন্দ্রিয়ত্ব অস্বীকার করা কোথায় রহিল ?"—

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব-অস্বীকারকারিগণ, এতদ্বিধ আপত্তির কি উত্তর দিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা তাহা বাহুল্য ভয়ে ব্যক্ত করিলাম না। ফল, সাংখ্য মতে মনঃ দশাধিক অর্থাৎ একাদশ স্থানের ইন্দ্রিয়।

জগতে আপত্তিকারীর অপ্রতুল নাই। "মনঃ ইন্দ্রিয়" শুনিবা মাত্র লোকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে "তবে, মনঃ কোন্ শ্রেণীর ইন্দ্রিয় ?—জ্ঞানেন্দ্রিয় ? কি কর্ম্মেন্দ্রিয় ?"—ইহাতে

* "উভयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियञ्च साधर्म्यात्" [ঈশ্বর কৃষ্ণ।]

কপিল বলেন "উভয়াত্মকং মনঃ" মনঃ উভয়াত্মক অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও বটে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ও বটে।

এই উভয় পক্ষের উপপত্তি এইরূপ—কোন ইন্দ্রিয়ই মনের অধীন না হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত হইতে পারে না। মন, যখন যে ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়, সেই ইন্দ্রিয়ই তখন স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মনকে পৃথক্ রাখিয়া যদ্যপি কোন ইন্দ্রিয় কদাচিৎ বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তবে, তাহার সে সংযোগ নিস্ফল হয়। অতএব, ইন্দ্রিয় নিচয়ের অধিষ্ঠাতা যে মন, সে, যখন যে ইন্দ্রিয়ের সহযোগে বিষয় গ্রহণ করে, তখন তাহাকে সেই ইন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য করা যায়। এইরূপে মনকে জ্ঞান, কর্ম্ম, এতদুভয়ের সম্পাদক উভয় বিধ ইন্দ্রিয়ের পদ প্রদান করা যায়।

মনের এমন কি সধর্ম্ম আছে যে, তদ্দৃষ্টে উহার ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে? আছে—"ইহা এবম্প্রকার—উহা এরূপ নহে"—ইত্যাদি বিবেচনা করাই মনের অনন্য-সাধারণ ধর্ম্ম। এরূপ সধর্ম্ম মনের ভিন্ন আর কাহারও নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয় কেবল বস্তু মাত্র স্পর্শ করিয়াই চরিতার্থ হয়। তদ্গত নীল, পীত, লোহিত,—আকার, ভঙ্গী, পরিপাটী ও পরিমাণ,—এসকল যে সেই বস্তুর বিশেষণ এবং সেই বস্তুটি যে ঐ সকল গুণবিশিষ্ট,—ইত্যাদি বিবেচনা করা অর্থাৎ যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট অবগাহী বোধ বলে, সেই বোধ অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা হয় না, কেবল মনের দ্বারাই হয়। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তুর সামান্যতঃ স্পর্শ অর্থাৎ ছায়া মাত্রের গ্রহণ—অনন্তর তাহা মনের নিকট সমর্পিত—পরে মনের দ্বারা তাহার ভাল মন্দ বিবেচিত হইয়া থাকে। মনের দ্বারা বিবেচিত

হইবার পূর্ব্বাবস্থা অস্পষ্ট এবং তাহারই উত্তরাবস্থা স্পষ্ট। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের এইরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট, দ্বিবিধ অবস্থা বা অংশ থাকাতেই সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা তজ্জাতীয় প্রত্যেক জ্ঞানের দুই দুই অবস্থা কল্পনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যখন মনের নিকট সমর্পিত হয় নাই, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ই গ্রহণ করিয়াছে, এই অবস্থার জ্ঞানাংশ সম্মুগ্ধজ্ঞান, আর যখন মন তাহা গ্রহণ করিয়া ভাল মন্দ নির্ণয় করিয়াছে, এই অবস্থার জ্ঞানাংশই প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ। ঐ সম্মুগ্ধ জ্ঞানের নামান্তর আলোচনা-জ্ঞান ও নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান। জ্ঞানের পূর্ব্বরূপ বা প্রথম অবস্থার সম্মুগ্ধ জ্ঞানটিকে হৃদয়ারোহণ করাইবার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা বালক, মূক, জড় প্রভৃতির জ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় অন্যমনস্ক অবস্থায় যে, কখন কখন কোন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত কোন কোন বিষয়ের আংশিক সংযোগ হয় এবং তন্নিবন্ধন যে এক প্রকার অস্পষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয়, বরং তাহাই সম্মুগ্ধজ্ঞান বুঝিবার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অনুমেয় বালকজ্ঞানের দ্বারা সম্মুগ্ধজ্ঞানের ঠিক্ আকার বোধগম্য করা সুকঠিন। যাহাই হউক, ফল, যখন মন কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, তখনই তাহা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বলিয়া ব্যবহার হয় এবং তখনই জ্ঞানের সাফল্য বা পূর্ণতা জন্মে *। ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক বিষয় গ্রহণ, অনন্তর তাহা মনের নিকট অর্পণ,

(২) "আলোচনমিন্দ্রিয়েণ বস্তিদমিতি সম্মুগ্ধম্—অনন্তরমিদমেবং নৈবম্ ইতি সম্যক্ কল্পয়তি নিশ্চয়ং দর্শয়তি বিশেষণবিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তি"—"সম্মুগ্ধং বস্তুমাত্রন্তু প্রাগ্গৃহ্ণন্ত্যবিকল্পিতম্। তৎসামান্যবিশেষাভ্যাং কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।"—"অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্ব্বিকল্পকম্। বালমূকাদিবিজ্ঞানসদৃশং শুদ্ধবস্তুজম্।"—"ততঃ পরং পুনর্ব্বস্তুধর্ম্মৈর্জাত্যাদিভির্যয়া। বুদ্ধ্যাঽবসীয়তে সাঽপি প্রত্যক্ষত্বেন সম্মতা।" [তত্ত্বকৌমুদী।]

এই প্রক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে অতিসূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান থাকাতে আমারা উহার ক্রমিকত্ব অনুভব করিতে পারি না, যেন আমরা একেবারেই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ করি।

অপিচ, সাংখ্য মতে মন, বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভিন্ন হইলেও অভিমানাত্মক বুদ্ধির সহিত মনের সম্পূর্ণ যোগ আছে। এজন্য মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,এই তিন্‌টিকেই অন্তঃকরণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। 'করণ' শব্দের অর্থ জ্ঞানের দ্বার, কেবল জ্ঞানের নহে, যে কোন প্রকার কার্য্যের দ্বার। অতএব মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,এই তিন্‌টি অন্তরে থাকিয়া আন্তরিক কার্য্য সমাধা করে বলিয়া উহা অন্তঃকরণ নামে অভিহিত হয়। অপর দশটি [চক্ষুরাদি পাঁচ্‌, আর বাক্‌-আদি পাঁচ] হইতে বহিঃকার্য্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তু ঘটিত জ্ঞানাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম বাহ্যকরণ। অন্তঃকরণ ও অন্তরেন্দ্রিয় এবং বাহ্যকরণ ও বাহ্যেন্দ্রিয় একই কথা। এতাবতা সাংখ্য মতে ১৩-টি ইন্দ্রিয় হইতেছে। তবে যে "সাত্বিকমেকাদশকম্" এই বলিয়া ইন্দ্রিয় গণনাস্থলে একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত অন্তঃকরণ-ত্রিতয়ের একত্ব জ্ঞান করিয়াই বলিয়াছেন।

অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, এই দ্বিবিধ করণের মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর করণের এক একটি অসাধারণ ধর্ম্ম [বিশেষক্ষমতা] আছে। অহার দ্বারাও অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ, পরস্পর ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—বাহ্যকরণ গুলি সাম্প্রত কাল অর্থাৎ বর্ত্তমানকালিক ও সমীপস্থ বস্তুতেই প্রবৃত্তিমান্‌—আর অন্তঃকরণ গুলি ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় ঘটিত বস্তুরই পরীক্ষক বা গৃহীতা। অত্যন্ত অতীত বা অত্যন্ত অনাগত বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ক্ষমতা

নাই। যে বস্তু সমীপে নাই, যে বস্তু বর্ত্তমান নাই, চক্ষুঃ তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রোত্র পারে না, নাসিকা পারে না, হস্ত পারে না, পদও পারে না, কেহই পারে না, কিন্তু মন পারে। কল্পনা শক্তির সাহায্যে মন সকলকেই গ্রহণ করিতে পারে। বাক্‌-ইন্দ্রিয়কে যে ত্রৈকালিক বস্তুর উপর আধিপত্য করিতে দেখা যায়, তাহা সে অন্তঃকরণের সাহায্যেই করে। বাগিন্দ্রিয়ের ত্রৈকালিকভাব প্রকাশ করা কেবল অন্তঃকরণের অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ অন্তঃকরণ অগ্রে যে সমস্ত নিশ্চয় করে—বাক্য সেই গুলিকে বাহিরে বহন করিয়া আনে মাত্র। "যুধিষ্ঠির ছিলেন—কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল—কল্কী অবতীর্ণ হইবেন—দেশের অবস্থা ভাল হইবে,"—এবম্প্রকার অতীত ও অনাগত ভাবের প্রকাশক বাক্য গুলি বাগিন্দ্রিয় স্বয়ং অবধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ করে না। মন অগ্রে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া দেয়—পশ্চাৎ বাক্য তাহার অনুকরণ করে—অর্থাৎ সেই নিশ্চিতভাবকে বাহিরে বহন করে। অতএব, বাহ্যকরণ গুলি কেবল সাম্প্রত অর্থাৎ বর্ত্তমান বস্তুর গৃহীতা—আর অন্তঃকরণ ত্রৈকালিক বস্তুরই গৃহীতা। নদীর পূর্ণতা দেখিয়া জ্ঞান হয় কোথাও বৃষ্টি হইয়াছে—দূরোত্থ ধূম শিখা দর্শনে অনুমিত হয় তৎপ্রদেশে বহ্নি আছে—অণ্ড-গ্রহণকারী পিপীলিকাশ্রেণীর সঞ্চরণ দেখিয়া অনুমান করা যায় অচিরাৎ বৃষ্টি হইবে—এ সকল নিশ্চয় করা অন্তঃকরণের কার্য্য; বাহ্যকরণের নহে। অন্তঃকরণের এতাদৃশ শক্তি থাকাতেই দৃশ্যমান জগৎ এত উন্নত হইয়াছে। যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, যে কিছু শাস্ত্রীয় ব্যাপার,—সমস্তই অন্তঃকরণের মহিমা *।

---

(১) "সাম্প্রতকালং বাহ্যং ত্রিকালমাভ্যন্তরং করণম্।" [ঈশ্বর কৃষ্ণ]

অপিচ, অন্তঃকরণের সাহায্য-ব্যতীত বাহ্যকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু বাহ্যকরণের সাহায্য ব্যতীত অন্তঃকরণের অনেক বিষয়েই অধিকার আছে। মনে কর,—যদি কদাচিৎ বাহ্যেন্দ্রিয় গুলি একেবারে ক্রিয়াশূন্য বা ধ্বংস হয়, আর একমাত্র অন্তঃকরণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অন্তঃকরণ কি তুষ্ণীম্ভাবে থাকিবে? —কখনই না। পূর্ব্বকালের দৃষ্ট, শ্রুত, আলোচিত ও অনুমত বিষয় গুলিকে স্বীয় কল্পনা শক্তিতে আরোহণ করাইয়া বহুল বিচিত্র ক্রীড়া করিতে থাকিবে। যদি কখন এমন ঘটনা হয় যে, বাহ্যেন্দ্রিয়েরা আত্ম-লাভ করিল না, অথবা মনের নিকট বিষয় সমর্পণ করিল না, বা পূর্ব্বে কখন করে নাই, তাহা হইলে অন্তঃকরণের কি দুর্গতি হয় বলা যায় না। বোধ হয়, ওরূপ হইলেও অন্তঃকরণ নির্ব্যাপার হইবে না। ফল, চক্ষুঃ-শ্রোত্র-নাসিকা-রসনা-ত্বক,—ইহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, এই পাঁচটির মধ্যে যথাক্রমে এক একটিতে এক একটির অধিকার, কিন্তু, মনের অধিকার পাঁচটিতেই আছে। চক্ষুর অধিকার শব্দেতে নাই, শ্রোত্রের অধিকার রূপেতে নাই, কিন্তু মনের অধিকার উভয়েতেই আছে। বাক্, পাণি এবং পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকের মধ্যেও ঐরূপ নিয়ম অর্থাৎ একের বিষয়ে অপরের অধিকার নাই। বক্তব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের অধিকার —গৃহীতব্য-বিষয়ে মাত্র হস্তেন্দ্রিয়ের অধিকার। বক্তব্যবিষয়ে হস্তের অনধিকার এবং গৃহীতব্য-বিষয়ে বাগিন্দ্রিয়ের অনধিকার। এইরূপ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক একটি নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে পরন্তু মনের অধিকার অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়েতেই আছে। এই নিমিত্ত, অন্তঃকরণ গুলি প্রধান, আর বাহ্যকরণ গুলি অপ্রধান অর্থাৎ অন্তঃ-

করণের অধীন । * এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মন যদি ইন্দ্রিয়ই হইল, তবে তাহার গোলোক অর্থাৎ আশ্রয় স্থান কোন্ প্রদেশ ?—

"মনের বাস ভূমি কোথায়?" কাপিল শাস্ত্রে ইহার নির্ণয় নাই। তবে সেশ্বর সাংখ্যকারের "নাভি চক্রে বা হৃৎপদ্মে মন্‌কে স্থির করিবে" এই উপদেশে এবং সাংখ্যানুমত যোগিদিগের "ভ্রূমধ্যে চ মনঃস্থানং" "ভ্রূ যুগলের অভ্যন্তর প্রদেশই মনের স্থান" এই কথায়, বোধ হয়, মস্তকাভ্যন্তরের কোন এক প্রদেশই মনের স্থান। কোন কোন দর্শনে হৃদয়াভ্যন্তরই মনের স্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যাহাই হউক, মনের স্থান নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। প্রাণিগণের চিন্তা, ধ্যান ও সুখ-দুঃখাদির অনুভব প্রভৃতি মানসিক কার্য্যোৎপত্তি কালে যে রূপ আকার ও ভঙ্গি প্রকাশ পায়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের অন্যতর স্থানই মনের বাস ভূমি হওয়াই সম্ভব।

ন্যায়াচার্য্যেরা বলেন, চক্ষুঃপ্রভৃতি যাবৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্থান যখন মস্তক—তখন মনেরও স্থান মস্তক। যেহেতু মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ই জ্ঞানের দ্বার অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ।

মন পদার্থ কি?—মনের কোনো আকার আছে কি না?—মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি?—মনের শক্তি ও অবান্তর প্রভেদ কত প্রকার?—এ সকল বিষয় জগৎ-রচনা কালে বক্তব্য—এক্ষণে কেবল মনের ইন্দ্রিয়ত্ব পক্ষ বর্ণন করা গেল †।

---

* "সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্ব্বং বিষয়মবগাহতে যস্মাৎ। তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি দ্বারাণি শেষাণি।" [সাংখ্যকারিকা]

† ন্যায় ও বৈশেষিক মতে মন নিরবয়ব ও নিত্য পদার্থ। অপিচ, পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তজ্জন্য এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মনঃ পরিমাণে এত সূক্ষ্ম যে, এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে আর

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান।

[অনুমান ও অনুমিতি]

প্রত্যক্ষ ঘটিত সমস্ত বক্তব্য শেষ করা হইয়াছে। সম্প্রতি যুক্তি ঘটিত বক্তব্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পূর্ব্বকথিত ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌক্তিক-জ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই হেতু ইন্দ্রিয়-পরীক্ষাপ্রকরণোক্ত নিয়ম গুলি এখানেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, " ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর সামান্য আকার [অস্পষ্ট ছবি] গ্রহণ করে মাত্র, তন্নিষ্ঠ বিশেষণ গুলির কল্পনা বা ভাল মন্দ বিবেচনা করেনা। কারণ, বিবেচনাশক্তি বা কল্পনাশক্তি, মন ভিন্ন

তাহার প্রদেশ থাকে না, সুতরাং তৎকালে অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটে না। রসনার কার্য্য মাধুর্য্যাদি রস গ্রহণ করা, আর, ত্বকের কার্য্য শীতোষ্ণাদি স্পর্শ গ্রহণ করা,—এতদুভয়কে আমরা ভোজন কালে এক কালীন হয় মনে করিয়া থাকি—বস্তুতঃ তাহা হয় না। উহা পূর্ব্বাপর ক্রমেই হইয়া থাকে। পরন্তু তদুভয় জ্ঞানের মধ্যে এত সূক্ষ্ম কাল ব্যবধান থাকে যে, তাহাদের পূর্ব্বাপরী ভাব কোন ক্রমেই লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্রকারেরা এই ব্যাপারটি শতপত্র ভেদন ন্যায় কল্পনা করিয়া লোকের বুদ্ধ্যারূঢ় করাইয়া থাকেন। শত পত্র ভেদন ন্যায়ের মর্ম্ম এই যে,এক শত পদ্ম পত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে, তাহা যেমন এক কালেই বিদ্ধ হইল মনে করা যায়, কিন্তু তন্মধ্যে যে, বিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বাপরী ভাব আছে, তাহা আর লক্ষ্য হয় না; সেইরূপ উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যেও পূর্ব্বাপরী ভাব থাকিলেও তাহা শীঘ্রতা নিবন্ধন উপলব্ধি হয় না।

উক্ত মতে মনের আর একটি গুণ আছে। লোকে তাহাকে সংস্কার বলে। এই সংস্কার-শব্দের অর্থ অনেক প্রকার। কোন এক বস্তুতে বেগ উপস্থিত করিলে, অথবা কোনবস্তুতে কিঞ্চিৎ চলন ক্রিয়া উপস্থিত করিলে, তজ্জন্য যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে—আবার আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও স্পন্দন, যদ্দ্বারা জন্মে তাহাকেও সংস্কার বলে। (এই সংস্কার মতবিশেষে পার্থিব পরমাণুর গুণ—মত বিশেষে জল, ও তৈজস পদার্থেরও গুণ বটে) বস্তুর স্মরণ

অন্য কাহারও নাই।" পূর্ব্ব কথিত বৃত্তান্তের মধ্যে এই অংশটি আপাততঃ স্থির রাখিতে হইবে। কারণ, এই অংশই যাবৎ-যৌক্তিক জ্ঞানের বীজ, ভিত্তি, বা জীবন। অগ্নিকাঙ্ক্ষী পুরুষ, দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, কুসুমার্থী ব্যক্তি গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত ও কুসুমের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যে, যাও—ঐদিকে যাও—অগ্নি পাইবে, কুসুমও পাইবে।

সূর্য্য উদয় হইয়াছেন, অস্তে যাইবেন, পুনর্ব্বার উদয় হইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইলে কল্য হইবে, কল্যের পর পরশ্ব, তৎপরে তৎপরশ্ব, ইত্যাদিক্রমে সংগৃহীত একটি সহস্র সংবৎসরাত্মক কালকে

হওয়া এবং 'ইহা সেই বস্তুই বটে' ইত্যাকার প্রত্যভিজ্ঞা উপস্থিত হওয়া যাহার প্রভাবে হয়, তাহাকেও সংস্কার বলে। এই তিন প্রকার সংস্কারের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিধ সংস্কার মনের ধর্ম্ম, তৃতীয়টি আত্মার ধর্ম্ম।

শারীর বিদ্যা বিশারদ মহর্ষি চরক বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় ও মন, আত্মার সহিত সংযুক্ত হইলে আত্মার চৈতন্য জন্মে। আত্মার চেতয়িতা মন—ইন্দ্রিয় সকলের প্রেরয়িতা মন—বেগ, স্পন্দন, আকুঞ্চন, প্রসারণ, তাবতেরই জনক ও উত্তেজক মন। (এই সকল দেখিয়া, মনের বা মনের আধারের তড়িন্ময়ত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে। বোধ হয় আর্য্যেরা, বিদেশীয়দিগের কল্পিত তাড়িত পদার্থকেই পার্থিব, জলীয়, বায়বীয় ও তৈজস পরমাণু বৃত্তি বেগাখ্য সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক বশতঃ যে মস্তিষ্ক জন্মে, তাহাতে উক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থেরই সমাবেশ আছে, সুতরাং তাহাতে তাড়িতও আছে। ঐ তড়িৎ মস্তিষ্ক স্থান হইতেই উদ্ভূত হইয়া আত্মাকে চৈতন্য যুক্ত করে—ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালন করে—লজ্জা নামক আকুঞ্চন, আহ্লাদ নামক প্রসারণ, এই রূপ পরিস্পন্দনাদি সকলক্রিয়াই নির্ব্বাহ করে) ইত্যাদি প্রকার নিগূঢ় ভাব সকল প্রাচীন দার্শনিক দিগের নির্ণয় মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

মনুষ্য এক নিমেষ পরিমিত কালের মধ্যে ধ্যানস্থ করিয়া শত সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য সম্ভার, সহস্র সহস্র প্রাণিবল সাপেক্ষ বৃহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলোভন দেখাইতে থাকে যে, ইহা কর—এইরূপে কর। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য্য প্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণি হৃদয়কে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগতের মানবিক (মনুষ্যসাধ্য) উন্নতি কিছুমাত্র হইত না।

ব্যবহারের যোগ্য দৃশ্য-পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি। প্রকৃতি, আর পুরুষ। কোন কোন মতে ঈশ্বর ও জীব। প্রকৃতি অহঙ্কারাদি ক্রমে ভূত-ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণতা হইতেছেন; জীব ভাবাপন্ন পুরুষ, সেই গুলি লইয়া যৌক্তিকজ্ঞান-সহায় মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্ম্মাণ করতঃ জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বর বাদীরা বলেন, ঈশ্বর ও জীব, এই উভয়ের কর্ত্তৃত্বে এই বিচিত্র জগৎ পরিপূর্ণ। ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার—জীব যাহা সৃষ্টি করে, তাহা অন্য প্রকার। জীব, ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থ লইয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কল্পনা নিয়োগ [কিঞ্চিৎ রূপান্তর] করে মাত্র। ঈশ্বর জল, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন—জীব সেই গুলি লইয়া গৃহ, কুড্য, ঘট, পট, ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতেছে। ঈশ্বর, মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহারই উপর পিতৃভাব, মাতৃভাব, স্ত্রীভাব, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতির কল্পনা করিতেছি। এইরূপ ঈশ্বর ও জীব, উভয়ের উভয়বিধ কর্তৃত্ব থাকাতেই জগতের এত বিচিত্রতা। পরন্তু, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সুদৃঢ়, অবিনশ্বর, স্বাধীন —আর

জীবের কর্তৃত্ব ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বরত্বাদি দোষাক্রান্ত। যাহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত সৃষ্টি—জীব হইতে যাহা জন্মে, তাহা সৃষ্টি নহে, তাহা নির্ম্মাণ। এই কথা ঈশ্বরের সেবকেরা ব্যক্ত করেন—কিন্তু ঈশ্বর-নাস্তিক সাংখ্যের মনোভাব অন্যবিধ। সাংখ্য বলেন, ঈশ্বর স্বয়ং অসিদ্ধ সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্বও অসিদ্ধ। প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে কি না, কর্ত্রীস্বভাবা প্রকৃতির আবেশে জীবভাবাপন্ন পুরুষের কাল্পনিক কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায়। প্রকৃতি-সমালিঙ্গিত পুরুষই সংসারি-জীব নামে ব্যবহৃত হয়। এই সকল জীবের মূলে কর্ত্তৃত্ব শক্তি না থাকিলেও ইহারা প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তা হইয়া আছে। এতদ্বিধ কাল্পনিক কর্ত্তৃত্বশালী জীব, আর প্রকৃত-কর্ত্রী প্রকৃতি, এই উভয়ের উভয়বিধ কর্ত্তৃত্বে জগদ্যন্ত্র যন্ত্রিত হইতেছে এবং তন্মধ্যে জীব যাহা নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহা জৈবিক সৃষ্টি বা জৈবিক-নির্ম্মাণ, আর যাহা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সে সমস্ত প্রাকৃতিক সৃষ্টি। *

ঐ জৈবিক-নির্ম্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ আন্তর-নির্ম্মাণ, অর্থাৎ [মনে মনে গঠন] পশ্চাৎ বাহ্যনির্ম্মাণ। এই আন্তর-নির্ম্মাণের এমনি আশ্চর্য্য গতি যে, যে বাহ্যদৃশ্যের নির্ম্মাণ কালে যে কাল, যত দ্রব্য, যত লোক-বল অপেক্ষা করে, সেই দৃশ্যটির আন্তরনির্ম্মাণ-কালে তত কাল, তত দ্রব্য, তত লোক বল, কিছুই লাগে না। জীব, ক্ষণ-পরিমিত-কালের মধ্যে বিনা দ্রব্যে, বিনা সাহায্যে, এমন এক দৃশ্য-নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, সেই দৃশ্যটির বহির্নির্ম্মাণ-কালে দশ সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্যসম্ভার ও অখণ্ডদণ্ডায়মান একটি দীর্ঘতম কাল

(*) "ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।" [দ্বৈতবিবেক]

ব্যয় করিলেও তাহা সুসম্পন্ন হয় না। আন্তরসৃষ্টি ও বাহ্যসৃষ্টির মধ্যে এইরূপ সমধিক প্রভেদ আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু জীব-নির্ম্মিত দৃশ্যপরিপাটী দেখিতে পাই, সে সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে জীব কদাপি তাহা বাহিরে উপস্থিত করিতে পারিত না। জীব, অগ্রে মনে মনে নির্ম্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্ম্মাণ করে। মনে মনে যাহার নির্ম্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নির্ম্মিত হইবে না। এই নিয়ম সার্ব্বভৌমিক এবং অব্যভিচারী। *

যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞান বলিতে গিয়া এ সকল বলা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে হইল। কারণ,ইহাই যুক্তির ভিত্তি বা মূল। যুক্তির সহিত বাহ্যবস্তুর এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সংশ্রব আছে যে যাহার ছায়ামাত্র ব্যক্ত করিতে হইলে লিখিত প্রস্তাব আপনা হইতেই আত্মলাভ করে। বিশেষতঃ বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের আশ্চর্য্য সহচারিত্ব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, [যে সকল বিষয় চিন্তা করিলে আপনা আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়] এসকল বিষয় কতকটা পর্য্যালোচনা না করিলেও যুক্তির প্রকৃতচিত্র নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে না—অন্ততঃ এজন্যও আমাকে কিঞ্চিৎ বলিতে হইল।

অপিচ, শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন,—

"किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं,
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च।"

(*) "मनसाऽर्थान् विनिश्चित्य पश्चात्प्राप्नोति कर्मणा।"
"संख्यातुं नैव शक्यानि कर्माणि पुरुषर्षभ।
अगारनगराणां हि सिद्धिः पौरुषहैतुकी॥" [বনপর্ব্ব]

ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কিরূপ যন্ত্রে—কোথায় থাকিয়া—কি দিয়া নির্ম্মাণ করিলেন?—যদি এই সকল বিষয় বুদ্ধিতে আরোহণ করাইতে চাও—তবে যুক্তি কুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর—সমাহিত হইয়া চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে যে ঈশ্বর কি প্রকারে কি কৌশলে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন না, এক সময়ে ইহা ঈশ্বরেরও সংকল্পে ছিল *। ফল, সঙ্কল্পাত্মক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, কিছুরই ইয়ত্তা করা যায় না।

এতাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের সহিত কাহার না পরিচয় থাকা উচিত? কিন্তু তৎপক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃতযৌক্তিক-জ্ঞান, আর কতকগুলি যুক্ত্যাভাস ও যৌক্তিকাভাস অর্থাৎ প্রকৃত-যুক্তি ও প্রকৃত-যৌক্তিকজ্ঞানের তুল্য বেশধারী কতকগুলি ভণ্ড যুক্তি ও জ্ঞান সর্ব্বদাই একত্র বাস করে, সুতরাং তন্মধ্য হইতে প্রকৃত যুক্তি এবং প্রকৃত-যৌক্তিক-জ্ঞানকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। প্রকৃত যুক্তি কি? চিনিতে না পারিলে, একটা যুক্ত্যাভাস মাত্র অবলম্বন করিয়া তজ্জনিত জ্ঞানের অনুগামী হইলে, মনুষ্যকে পদে পদে প্রতারিত হইতে হয়। অতএব, যে উপায়ে হউক, প্রথমতঃ প্রকৃত যুক্তি কিরূপ—তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জানিবার উপায় কি? যুক্তি বা যৌক্তিকজ্ঞান একটি নহে, তাহা অসংখ্য, সুতরাং অসংখ্য-যৌক্তিকজ্ঞানের এক একটি করিয়া চিনিতে হইলে, সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও শেষ হইবে না। যদ্যপি প্রকৃত যুক্তির কোন বিশেষ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে সেই লক্ষণ

(*) "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" [শ্রুতি]

যাহাতে যাহাতে দেখিতে পাইব, তাহাকেই প্রকৃত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিব, অন্যকে পরিত্যাগ করিব; কেন না, একটির লক্ষণ অবগত থাকিলে তদ্দ্বারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি লাভ করা যাইতে পারে। অতএব প্রকৃত যুক্তির যদি কোন প্রকার লক্ষণ থাকে— তবেই মনুষ্য যুক্তি-পরিচয়ে নৈপুণ্য লাভ করিতে পারে, নচেৎ না * ।

যুক্তি-নিপুণ দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, কোন বিষয়ে মনুষ্যের হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়েরই যখন একটা না একটা লক্ষণ আছে, তখন যুক্তি বা যৌক্তিকজ্ঞানেরও লক্ষণ আছে। প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিকজ্ঞানের লক্ষণ আপাততঃ এইরূপ অবধারিত কর;—

"এই জগতে পৃথক্ পৃথক্, বা একত্রিত, অথবা পূর্ব্বাপরীভাবে [কার্য্য কারণ ভাবে] অবস্থান করে, ঈদৃশ পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিনাভাব সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর অবিযুক্ত বা অপৃথক্‌ভাবে অনুস্যূত থাকা স্বাভাবিক বলিয়া অবধারিত আছে, তাহার একটির উপলব্ধি হইবামাত্র অন্যটির সহিত যে স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে, মনো মধ্যে সেই সম্বন্ধের স্মরণাত্মক-জ্ঞান উপস্থিত হইয়া যে তদ্বিষয়ে মনের পরীক্ষাত্মক ব্যাপার উপস্থিত হয়—তাহারই নাম যুক্তি এবং তাহারই ফল বা তৎসমুথ জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান।"

এই লক্ষণটি কাপিল সূত্রের অনুসারী †। সূত্রকার মাত্রেই সংক্ষেপ বক্তা। সূত্র দ্বারা নানাবিধ অর্থ ও রীতি-পদ্ধতির সূচনা

(*) "সূক্ষ্মধীঽপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বতঃ।
লক্ষণেন তু সিদ্ধানা-মন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ॥" [সায়নাচার্য্য]

(†) "প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞান মনুমানম্।" [কাপিলসূত্র]

মাত্র করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলা কেবল আচার্য্যদিগের রীতি, সূত্রকারদিগের নহে। সূত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়া বলেন না বলিয়া, আচার্য্যেরা সে সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বলেন। সূত্রার্থকালে যে পথে, যে রীতিতে, যে প্রকারে যে যে অর্থের বিস্তার করিতে হইবে, বক্তব্য বিষয়ের শরীর যে রূপে চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই সূত্র মধ্যে আংশিকরূপে নিহিত থাকে। আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়াই তাহাকে বিস্তার করেন। যুক্তি ও যৌক্তিক-জ্ঞানের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা সূত্রানুসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় নাই, নির্দ্দোষও হয় নাই। এজন্য পুনশ্চ উহাকে আচার্য্যদিগের রীতিতে বলা আবশ্যক, কিন্তু সম্পূর্ণ আচার্য্য-রীতিতে বলিতে গেলে এই প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে কেবল এই বিষয়ের নিমিত্ত একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক না করিলে তাহা সঙ্কুলন হইবে না। সুতরাং অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ না করিয়া তন্মধ্য হইতে অবশ্য-বক্তব্য স্থূল স্থূল অংশ গুলিকেই বিবৃত করা যাইতেছে।

কোন পদার্থ, কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে,—কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে অন্য এক বস্তুরও অভাব হয়,—কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে, অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে,—ইত্যাদি প্রকারে এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে স্বাভাবিক-সম্বন্ধ থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের নাম অবিনাভাবসম্বন্ধ ও ব্যাপ্তি।

পদার্থে পদার্থে যে স্বাভাবিক-ব্যাপ্তি বিদ্যমান আছে, সেই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকাই যুক্তির পূর্ব্ব রূপ, আর মনুষ্য-মনে তাহার অভ্রান্ত সংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই উত্তর রূপ। এই উভয়বিধ রূপ

একত্রিত হইলেই যুক্তি জীবন লাভ করিতে পারে, নচেৎ পারে না। বহ্নির সহিত ধূমের,* চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের, স্বাভাবিক ব্যাপ্তি

---

* যদি কাহারও এমন জ্ঞান থাকে যে, বাষ্প ও ধূম একই বস্তু, তবে তিনি অনেক সময়ে অনেক বিভ্রাট ঘটাইবেন। ফল, ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশমাত্র নাই কিন্তু ধূমে আছে। বাষ্প কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু। ধূমে জলীয় পরমাণু আছে পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবাংশ ধরা পড়ে কজ্জলে। একটি তৈজস পাত্রের গাত্রে স্নেহ দ্রব্য ম্রক্ষণ করিয়া ধূমোদ্গম স্থানে ধৃত করিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবাংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবীধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কেন না, ঐ প্রকার রূপই পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল। ইহা পরীক্ষিত কি অপরীক্ষিত, কে জানে?—উহা কিন্তু "যৎকৃষ্ণং তৎপৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং"— ইত্যাদি বৈদিকবাক্যে গ্রথিত আছে। অর্থ এই যে পৃথিবী ধাতু কৃষ্ণবর্ণ ও জল ধাতু শুক্লবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে, জলাংশও আছে। বাষ্পে কেবলমাত্র জল আছে। [বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে, কেন না বায়বীয় পরমাণু দ্বারা কখন কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না] এতন্নিবন্ধন ধূম অপেক্ষা বাষ্প শুভ্রবর্ণ (ক্যাঁড়াশে বর্ণ) আর বাষ্প অপেক্ষা ধূম কিছু কৃষ্ণবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে বলিয়া, যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূম স্পর্শ হয়, সে বস্তু মলিন হয়, কিন্তু শতবৎসর বাষ্প স্পর্শ হইলে সে পদার্থ মলিন হইবে না, প্রত্যুত, বাষ্প স্বীয় জলাংশ দ্বারা সেই বস্তুকে আর্দ্র রাখিবে। অপিচ, বাষ্প ও ধূম এক কারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ সাধারণ উষ্মতা। উষ্মতা ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উষ্মতা, গভীরজল জলাশয়ের মধ্যেও বাস করে— অগ্নি প্রভৃতি তৈজস পদার্থেও বাস করে। শীতকালে যে, জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সে বাষ্পেরও কারণ উষ্মতা। জলের মধ্যে উষ্মতা থাকে কি না, তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীতকালের অতি-প্রত্যূষে নদী জলে স্নান করিয়াছেন।

বাষ্প ও ধূমের প্রায় একাকারতা আছে বলিয়া, কখন কখন বাষ্পেতে ধূম ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম ও বাষ্প কোন মতেই এক পদার্থ নহে। বাষ্পেতে ধূম-ভ্রম হইলে, সেই ভ্রমগৃহীত ধূমের দ্বারা বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে না কিন্তু তৎপ্রদেশে সাধারণ উষ্মতার সত্তা নিশ্চয় হইবে। এই সকল বিষয় ন্যায়গ্রন্থে ও বৈদান্তিকদিগের গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আছে। দেখিয়া দেখিয়া, যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে, ধূম থাকিলে নিশ্চয় অগ্নি থাকে, আর বেগ উপস্থিত করিলে চলন অবশ্য হইবে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকট যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে, অন্যের নিকট করিবে না।

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন করিলে, তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, কোন পদার্থান্তরের সংসর্গাধীন ঘটিয়াছে; তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তিকে অস্বাভাবিকব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার কর। যদি পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তবে তাহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া গ্রহণ কর।

মনে কর—কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য [এক স্থানে অবস্থান] দৃষ্ট হইল। হইলে, প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যক যে, ধূম ও বহ্নি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। বহ্নির সহিত ধূমের ? কি ধূমের সহিত বহ্নির ? যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকা নির্ণয় হয়, তবে ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে। আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব থাকাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে বহ্নির সত্তায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব, কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির অবিনাভাব সম্বন্ধ স্বাভাবিক, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। সে পরীক্ষা অন্য প্রকার নহে, কেবল দাহ্য পদার্থের প্রক্ষেপ ও নিক্ষেপ [অর্থাৎ একটি দাহ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য আর একটি দাহ্যের সংযোগ করা]। পরীক্ষা প্রয়োগ করিলে ইহাই নির্ণীত হইবে যে, বহ্নির সহিত জলীয়-পরমাণুবহুল-দাহ্য-পদা-

র্থের সংযোগ হইলেই ধূম জন্মে, তৈজস পদার্থের সহযোগে ধূম জন্মে না। কেন না, বহ্নি মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, তাহার দাহন কালেই ধূম জন্মে, কিন্তু এক খণ্ড সুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সুবর্ণ খণ্ডের দাহন কালে ধূম জন্মে না। অতএব, ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি-জিজ্ঞাসু-ব্যক্তির ইহাই অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি, ধূমের সহিত নহে। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক নহে। তাহা পদার্থান্তরের [দাহ্য বিশেষের] সংযোগ বশতঃই ঘটিয়াছিল। এই রূপ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও অবিছিন্ন মূল ধূমের উদ্গম দেখিতে পাইলে, তন্মূলে বহ্নি প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত তদুপরি ধূমের আশা করা যাইতে পারিবে না।

যে কারণ দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব নির্ণয় করা যায়, সেই কারণ-দ্রব্যটির নাম উপাধি। জলীয়-পরমাণুবহুল দাহ্য পদার্থের সংযোগ, ধূমের সহিত বহ্নির অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি প্রকাশ করিয়া দিতেছে বলিয়া উহা ধূমের সহিত বহ্নির অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বা অস্বাভাবিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের হেতু হইতেছে সুতরাং কথিত স্থলে ঐ আর্দ্রেন্ধন [সজল কাষ্ঠ] সংযোগই উপাধি হইয়াছে।

উপাধি দুই প্রকারে উপস্থিত করা যাইতে পারে। এক শঙ্কিত রূপে, অপর সমারোপিত রূপে। উপাধি প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহা সমারোপিত উপাধি হইবে, আর উপাধি থাকার শঙ্কা মাত্র করিলে তাহা শঙ্কিত নামে পরিগণিত হইবে। এই দুই প্রকার উপাধিই অনিষ্টকারী অর্থাৎ প্রকৃত যুক্তির আচ্ছাদক। পরন্তু তদুভয়ের

মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমারোপিত-উপাধি উৎপন্ন-জ্ঞানের অযাথার্থ্য প্রতিপন্ন করে ; আর, শঙ্কিত উপাধি তাহার যাথার্থ্য পক্ষে সন্দেহ জন্মায়। যুক্তি নির্ম্মাণের পর, তন্মধ্যে যদি কোন উপাধি থাকা নিশ্চয় হয়, তবে সে যুক্তিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর যদি কেবল মাত্র উপাধি থাকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে সেই আশঙ্কামাত্রের পরিহার করিতে হইবে। আশঙ্কা নিবারণের অদ্বিতীয় উপায় তর্ক। তর্ক প্রয়োগ করিলেই আশঙ্কা নিবারণ হইবে।

মনে কর, ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে। এই একটি স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। এতন্মধ্যে যদি কোন প্রকার উপাধি থাকার আশঙ্কা কর,—তবে তাহা এইরূপে ব্যক্ত কর। যথা—"ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবে, এতৎপ্রতি কারণ কি? নিয়মই বা কি? যদিও দেখা যায় 'ধূম-মূলে বহ্নি থাকে' তথাপি তাহা নিয়মিত কি না সন্দেহ। যদি তাহা নিয়মিতই হয়, তবে সে নিয়ম স্বাভাবিক কি না সন্দেহ—কেন না তাহা স্বাভাবিক না হইতেও ত পারে?—যদি বল, বহ্নির সহিত ধূমের নিরন্তর একাধিকরণ্য দেখিয়াছি—যখন তাহা সদাকাল দেখিতেছি তখন তাহা স্বাভাবিক না হইবার বিষয় কি? আমি বলি, আছে। ঐ একাধিকরণ্য [অবিযুক্তভাবে থাকা] কোন প্রকার অজ্ঞাত পদার্থের সংসর্গাধীন ঘটিবার আটক নাই, যাহার সংসর্গে দৃষ্ট-একাধিকরণ্য ঘটিয়াছে, সে পদার্থ লুকায়িত আছে—আমরা জানিতে পারিতেছি না।"

এইরূপে "ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি নিশ্চয়ই থাকে" এই ব্যাপ্তিতে ঔপাধিকত্ব [অস্বাভাবিকত্ব] শঙ্কা করিয়া তন্মধ্য হইতে উপাধি বাহির করিবার চেষ্টা পাও—পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও যদি উপাধি নিষ্কাশিত না হয়, উপাধি লুকায়িত থাকার আশঙ্কা দূর না হয়, তবে

উহাতে তর্ক প্রয়োগ কর, তর্ক প্রয়োগ করিলে হয় ত উপাধি-টি নিষ্কাশিত হইয়া আসিবে, না হয়, শঙ্কা দূর হইবে।

তর্ক,—"কার্য্য [জন্য] মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণ [জনক] সংলগ্ন থাকে। কস্মিন্ কালেও ইহার অন্যথা হয় না। এই নিয়মানুসারে উৎপন্ন ধূম, বহ্নির কার্য্য বলিয়া, উহার মূলদেশে বহ্নিকে অবশ্যই সংলগ্ন থাকিতে হইবে। যদি উদ্গত ধূমের মূলদেশে বহ্নি না থাকে বল—আর ধূম যদি বহ্নিকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র হইতেও উদ্গত হয় বল—তবে ধূম, বহ্নিভিন্ন অর্থাৎ জলাদি পদার্থ হইতেও জন্ম লাভ করে, ইহাও বলিতে পার। কিন্তু ধূম বহ্নি-ব্যতীত জন্ম লাভ করিতে পারে না, সুতরাং অবশ্য জায়মান বা দৃশ্যমান ধূম-দণ্ডের মূলে বহ্নি সংলগ্ন আছে।"

এইরূপ তর্ক-সংযোগ দ্বারা কথিতবিধ উপাধিদ্বয়ের সদ্ভাব অথবা আশঙ্কা নিরাকৃত কর—উপাধি নিরাকৃত হইলেই ব্যাপ্তির স্বাভাবিকত্ব স্থির হইবে। *

এ জগতে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি তিন প্রকার ভিন্ন চতুর্থ প্রকার নাই। তাহার একের নাম অন্বয়-ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়ের নাম ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি, তৃতীয়ের নাম উভয়াত্মক অর্থাৎ অন্বয়-ব্যতিরেক। [অন্বয়ও

---

* তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে। উহা প্রমাণ গত সর্ব্ব প্রকার সংশয়ের নিরাশক-মাত্র। যেখানে যে প্রকার তর্কের উপযোগিতা থাকে, সেখানে সেই প্রকার তর্কের নিয়োগ করিতে হয়। তর্কের ভিত্তি কার্য্য কারণ ভাব। কার্য্য কারণ ভাব বজায় রাখিয়া জ্ঞানের শরীর পরিষ্কার করার নাম তর্ক। ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে কি না জানিবার জন্য যে তর্ক অবতারণ করিতে হইবে, তাহাও কার্য্য-কারণভাব ঘটিত। প্রদর্শিত তর্কের আকার দার্শনিকেরা সংস্কৃত ভাষায় "ধূমো যদি বহ্নিব্যভিচারী স্যাৎ তদা ধূমজন্যোঽপি ন স্যাৎ।" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

আছে ব্যতিরেকও আছে] এই ত্রিবিধ ব্যাপ্তির লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে দৃষ্টি কর—

অন্বয়-ব্যাপ্তি—যে থাকিলে যে অবশ্যই থাকে [যথা, ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি অবশ্যই থাকে।]

ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি,—একটির অভাব হইলে তৎসঙ্গে অন্য একটির অভাব হয় [যথা, বহ্নির অভাব হইলে ধূমের, কিংবা কারণের অভাব হইলে কার্য্যের অভাব হয়।]

উভয়াত্মক বা অন্বয়-ব্যতিরেক—যে থাকিলে যে নিশ্চয় থাকে, এবং না থাকিলে নিশ্চিত থাকে না। [যথা, আর্দ্র-দাহ্য সংযুক্ত বহ্নি থাকিলে নিশ্চিত ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না।]

এই তিন প্রকার ব্যাপ্তির যে কোন ব্যাপ্তি, যে পদার্থের সহিত যে পদার্থে সম্বন্ধ আছে—তত্তাবৎ অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য যুক্তিকুশল হইতে পারে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান সঞ্চয় করিবার উপায় আর কিছুই নহে—কেবল ভূরি ভূরি পদার্থের প্রকৃতি, ভাব, গতি, জাতি, সম্বন্ধ ও কার্য্য-কারণ ভাব প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা—বার বার পর্য্যবেক্ষণ করা *। যিনি যে পরিমাণে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে যৌক্তিক-জ্ঞানের অধিকারী হইবেন।

অপিচ, ব্যাপ্তি দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তাহার মধ্যে একটি পদার্থ ব্যাপ্য, অপর গুলি ব্যাপক। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের মধ্যে "যাহার সহিত" এই অংশ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই পদার্থকে ব্যাপ্য আর "যাহার অবিনাভাব সম্বন্ধ" এই অংশের

---

* "কার্য্য-কারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তর দর্শনাৎ॥" [মাধবাচার্য্য]

দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে, তাহাকে ব্যাপক বলিয়া জানিতে হইবেক। দার্শনিক ভাষায় ব্যাপ্যের নামান্তর—হেতু ও লিঙ্গ। আর ব্যাপকের নামান্তর স্থান বিশেষে সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা। এই সাধ্য বা প্রতিজ্ঞার আধার বা আশ্রয় স্থানের নাম পক্ষ।

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষ্যে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তত্তাবৎ একত্রিত বা যোগ করিয়া তদ্দ্বারা এইরূপ নিষ্কর্ষ লাভ হইতেছে যে, "পরীক্ষাশীল বহুদর্শিব্যক্তি বস্তুর স্বভাব, প্রকৃতি, জাতি, গুণ, কার্য্য-কারণভাব ও সম্বন্ধ প্রভৃতি নিরন্তর পর্য্যবেক্ষণ করেন বলিয়া তত্তাবৎ গুলি তাঁহার অন্তরে সংস্কারাবদ্ধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তি যদি কখন কোন প্রকার পদার্থ অবলোকন করেন, বা, মনে মনে ধ্যান করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সেই সকল সংস্কারগুলির উদ্বোধ হয়। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র তদ্বলে "ইহা অমুক বস্তু—ইহার সহিত অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ"—ইত্যাদিপ্রকার পূর্ব্বালোচিত ভাব সমস্তের স্মরণ বা আন্দোলন হয়। এই আন্দোলনাত্মক স্মরণের ফল জ্ঞান-বিশেষের উৎপাদক মানসিক ব্যাপার। এই মানসিক-ব্যাপার যে জ্ঞানকে প্রসব করিবে, সেই জ্ঞানেরই নাম যৌক্তিকজ্ঞান, আর সেই সুসম্বদ্ধ আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের নাম যুক্তি। তৎপ্রকাশক বাক্যের নামই যুক্তিবাক্য। এই যৌক্তিক-জ্ঞান অব্যভিচারী। ইহার নামান্তর অনুমিতি ও অনুমান [অনুমিতিকেও কখন কখন অনুমান শব্দে উল্লেখ করা হয়] *।

* ধূম ও বহ্নি ঘটিত দৃষ্টান্ত গুলি স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে সমর্থ, এ জন্য কোন সূক্ষ্ম পদার্থ অবলম্বন না করিয়া, ধূম ও বহ্নিকে লইয়া সকল কথাই বলা

এবম্বিধ যৌক্তিক-জ্ঞান কখন আপনার অন্তরে স্বতঃই উৎপন্ন হয়, কখন বা পরের অন্তরে বলপূর্ব্বক উৎপাদন করিতে হয়। এ জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা ইহাকে দুই শ্রেণী ভুক্ত করিয়া থাকেন। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে কোন গোলযোগ নাই; কারণ, কোন পদার্থ দর্শন করিলে পর, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের হৃদয়ে আপনা হইতেই তৎসম্বন্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে—পূর্ব্ব কথিত যুক্তির আন্দোলন বা তাহার শরীর বিস্তার করিবার আবশ্যক হয় না। চক্ষুর সহিত বিষয়ের সংযোগ হইবামাত্র বিনা আন্দোলনে যেমন জ্ঞানোৎপত্তি হয় অর্থাৎ তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি চক্ষুর্দ্বারা এই কারণে এই রূপ করিয়া ইহা দেখিতেছি,—এইরূপ, স্বার্থানুমান উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বা তৎসমকালে আন্দোলন হয় না যে আমি এই কারণে এবংপ্রকারে ইহা জানিতেছি; অতএব স্বার্থানুমানে যুক্তি কল্পনার প্রয়োজন হয় না—পরার্থানুমান পক্ষেই উহার প্রয়োজন। কারণ, অবোধ ব্যক্তিকে বা সংশয়িত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইলে, তাহার চক্ষুর উপর যুক্তির শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে না পারিলে, হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে না পারিলে, সে বুঝিবে না—সে নিঃসন্দিগ্ধও হইবে না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা তাদৃশ ব্যক্তির নিমিত্ত যুক্তির শরীর-নির্ম্মাণের উপযোগী পাঁচটি অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি অবয়বের নাম যথাক্রমে প্রতিজ্ঞার উল্লেখ, হেতু প্রদর্শন, উদাহরণ,

---

হইল। অপিচ, সংস্কার যদি ভ্রম দোষে দুষ্ট থাকে, তবে তৎসংক্রান্ত যুক্তিগুলি মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি স্থির করিতে হইবে, সেই বস্তুর দেখা যদি ঠিক দেখা না হয়; তবে তদ্রূপ যুক্তি কোন কার্য্যকারী হইবে না।

দেখান, উপনয় অর্থাৎ ব্যাপ্তির স্মরণ করান এবং অবশেষে নিগমন। অর্থাৎ ব্যাপ্য বা হেতু বস্তুটি দেখাইয়া তাহার সহিত যাহার অব্যভিচারী সহচারিত্ব আছে—তাহার অবশ্য সত্ত্বা অনুভব করান।

প্রতিজ্ঞা—যেটি সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ বা স্থাপন করার নাম প্রতিজ্ঞা [যথা, সম্মুখস্থ পর্ব্বতে বহ্নি আছে]। পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতে হইবে সুতরাং কথিতরূপে তাহার উল্লেখ করাই প্রতিজ্ঞা শব্দের বাচ্য।

হেতু *—ব্যাপ্য পদার্থটি প্রদর্শন করা [যে অদৃশ্য বস্তুটি সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার সহিত দৃশ্যবস্তুটির যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে,

---

* হেতুটি নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্দারা সত্তা লাভের আশা করা যাইতে পারিবে না। এজন্য হেতুটি সদোষ কি নির্দ্দোষ, বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরিত্যাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর,—এই নিয়ম সর্ব্বত্র অনুস্যূত থাকিবে। হেতুর নির্দ্দোষতা প্রমাণ হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব নিশ্চয় হইবে। দুষ্ট অর্থাৎ সদোষ হেতুকে শাস্ত্রকারেরা 'হেত্বাভাস' বলিয়া থাকেন। হেত্বাভাসের অর্থ এই যে, দেখিতে হেতুর ন্যায় কিন্তু তাহা বাস্তবিক হেতু নহে। এই হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, ও বাধিত। এই সকল দোষ যুক্ত হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে, সাধ্যের সহিত তাহার যদি কখন কোথাও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সব্যভিচার বলিয়া জান। পক্ষে হেতুর সদ্ভাব এবং হেতুর সহিত সাধ্যের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ বলিয়া জান। বিরুদ্ধ-প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাকে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস বল। সাধ্যের অভাব-বোধক হেত্বন্তর থাকিলে তাহাকে সৎপ্রতিপক্ষ বলা যায়। প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে তাহা বাধিত নামে ব্যবহৃত হয়। এসকল বিস্তার করিতে গেলে অতি বাহুল্য হয়, বিশেষতঃ এ সকল বিচারের প্রদর্শন করা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। হেত্বাভাস বা সদোষ হেতুর লক্ষণ গুলি সংক্ষেপে বলা হইল, এতদনুসারে সমন্বয় বা উদাহরণ স্থল গুলি খাটাইয়া লও।

পক্ষে [হেতুর অধিকরণ প্রদেশে] সেই বস্তুটির অভ্রান্ত অস্তিত্ব প্রদর্শন করা [যথা, দেখ—দৃশ্যমান পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে]।

উদাহরণ—ব্যাপ্য-পদার্থ থাকিলে যে তথায় ব্যাপক-পদার্থও থাকে, এমন একটি স্থল দেখান। [যথা, স্মরণ করিয়া দেখ, পাক-শালায় ধূম থাকে—তন্মূলে বহ্নিও থাকে]।

উপনয়—অনুমেয়-পদার্থটির সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য [হেতু] পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা তাহাকে নিঃসংশয়িত রূপে স্মরণ করান। [যথা, ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। স্মরণ কর, তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেই সেই খানেই বহ্নি দেখিয়াছ]।

নিগমন—তর্ক দ্বারা সংশয়চ্ছেদ করিয়া পুনশ্চ প্রতিজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধির বিষয় উল্লেখ করা [যথা, যখন অমুক বস্তু দেখিতেছ—তখন ওখানে অবশ্য অমুক আছে; যে যেহেতু, অমুক থাকিলে অমুক অবশ্যই থাকে। মনে কর—যেমন বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম যেখান হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে উদ্গত হয়, তাহার মূলপ্রদেশে বহ্নি অবশ্যই থাকে। ধূমমূলে বহ্নি না থাকিবার কারণ কিছুমাত্র নাই। ধূমোদ্গমের মূল প্রদেশ যে দিন বহ্নিশূন্য হইবে, ধূম সেদিন নিশ্চয় বহ্নি ভিন্ন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু আজও তাহা হয় নাই। অতএব যত দিন বহ্নি ধূম জন্মাইবে—ততদিন ধূমের মূলে বহ্নিকে থাকিতে হইবে]।

এইরূপে পাঁচটি অবয়ব দ্বারা যুক্তির শরীর উৎপন্ন হয়। উৎপন্নশরীর যুক্তি, মনুষ্যদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীতপদার্থে উপনীত করিয়া থাকে। কোন কোন বৈদান্তিক আচার্য্য, কথিতবিধ পাঁচটি

অবয়বের মধ্যে তিন্‌টি মাত্র অবয়বকে কার্য্যকারী মনে করেন। [অন্য দুইটি অকর্ম্মণ্য] সুতরাং ইহাঁদের মতে তিন্‌টি মাত্র অবয়ব যুক্তির অঙ্গ। সে তিনটি এই,—প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ। আবার কেহ কেহ বলেন, তিন্‌টিরও আবশ্যক নাই, কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের নিকট, প্রতিজ্ঞার উপর একমাত্র হেতু প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হয়। এমতে দুইটি মাত্র অবয়ব বলা হইতেছে।

এবম্বিধ অবয়ব সম্পন্ন যুক্তি 'ন্যায়' নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গৌতম ও কণাদ, এই পঞ্চাবয়ব ন্যায়কে বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের নাম ন্যায় গ্রন্থ বা ন্যায়-শাস্ত্র হইয়াছে। এই যুক্তির সহিত মনুষ্য মনের যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে—যুক্তি মানবমনের উপর যে কি পরিমাণে প্রভুত্ব করিতে পারে,—তাহা অবধারণ করিয়া বলা যায় না। ফল, সন্দিগ্ধ-পুরুষের সন্দেহ ভঞ্জন, ভ্রান্তপুরুষের ভ্রম-নিরাকরণ, অবোধপুরুষের বোধ উৎপাদন করিতে একমাত্র যুক্তিই পটীয়সী। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে, কি আধ্যাত্মিক কি বাহ্যিক, কোন প্রকার উন্নতি হইত না ; এমন কি, এ জগৎ পুত্র কলত্রাদির সহিত একত্র বাসেরও উপযোগী হইত না।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে যুক্তির গতি ও নাম তিন প্রকার। এক প্রকারের নাম পূর্ব্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তদ্ভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতোদৃষ্ট।

পূর্ব্ববৎ—"কার্য্য থাকিলে তাহার কারণও থাকে" এবম্প্রকার অন্বয়-ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তির উত্থান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ব-বৎ। [যথা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান বা নির্ণয় করা]

এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে মনুষ্য, জগতের শৈশবাবস্থা, ঈশ্বরের বাস ভূমি ও স্বর্গের বৈভব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

শেষবৎ—"কারণের অভাবকালে তৎসঙ্গে কার্য্যেরও অভাব হয়" এবম্বিধ ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি ঘটিত যুক্তির নাম শেষবৎ। [কারণের ভাবাভাব-অনুসারে কার্য্যেরও ভাবাভাব নিশ্চয় করা] এই জাতীয় অনুমানের বলে মনুষ্য, মৃত্যুর উত্তর কাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়।

সামান্যতোদৃষ্ট—তুল্য-স্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীয় বস্তুর একটি মাত্র দেখিয়া, তৎ সজাতীয় অন্য একটি অদৃশ্য বস্তুর নির্ণয় করা। [যথা,—মহানসে (পাক শালায়) ধূম ও বহ্নির একত্র সমাবেশ দেখিয়া তদুভয়ের স্বাভাবিক সহচারিত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এক্ষণে পর্ব্বতে কি স্থানান্তরে তত্তুল্য অর্থাৎ তৎসদৃশ ধূমান্তর দেখিয়া তৎসহচর বহ্নি-সজাতীয় অন্য বহ্নির সদ্ভাব নির্ণয় করা হইতেছে] এই জাতীয় অনুমানের বলে জীব, যাবৎ-অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়] *।

এই তিন প্রকার যুক্তির অনির্ণেয় বস্তু বর্ত্তমান দৃশ্য-জগতে নাই। এই তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয় এমন অবস্থাই নাই, সময় নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি, প্রত্যক্ষের উপর প্রভুত্ব করে, বাক্যের উপরও প্রভুত্ব করে। যুক্তি, প্রত্যক্ষ ও বাক্য এতদুভয়ের অতীত বিষয়ের উপরও প্রভুত্ব করে। কোন পদার্থ দেখিলে, তাহা ঠিক্ দেখা হইল কি না, যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে নির্ণয় হয় না। কেহ কোন উপদেশ বাক্য বলিলে, তাহা স্বরূপার্থ-দ্যোতক কি না, যুক্তি ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। অতএব, ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত

* "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ" [সাংখ্যকারিকা]

সম্পূর্ণ পরিচয় রাখা আবশ্যক এবং ইহাকে বলিতে হইলে বিস্তার করিয়া বলাই উচিত। যুক্তি-শূর আচার্য্যেরা যুক্তির প্রতি যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায় উদ্ঘাটন করা অস্মদাদির অসাধ্য সুতরাং প্রকৃতযুক্তি ও প্রকৃতযৌক্তিক-জ্ঞানের একটি রেখা মাত্র কল্পনা করিয়া, ইহাকে অপূর্ণ অবস্থাতেই শেষ করিলাম।

ঔপদেশিক-জ্ঞান ও উপদেশর স্বরূপ।

এই ঔপদেশিক-জ্ঞানের অন্য নাম 'শাব্দ জ্ঞান' ও 'শাব্দী-প্রমা' এবং ঐ উপদেশের নামান্তর শাস্ত্র, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি।

কাষ্ঠ লোষ্ট্রে আঘাত করিলেও শব্দ উৎপন্ন হয়, আবার আত্ম-প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতেও শব্দ নির্গত হয়, পরন্তু তদুভয়প্রকার শব্দের কার্য্যকারিত্ব এক রূপ নহে। উক্ত উভয় জাতীয় শব্দের প্রয়োজন ব্যবহার ও কার্য্যকারিত্ব, সমস্তই ভিন্ন। এতদ্দৃষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের দুইটি জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। একটি জাতি ধ্বন্যাত্মক, অপর জাতি বর্ণাত্মক। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দকে আমরা অব্যক্ত শব্দ বলিয়া ব্যবহার করি, স্থল-বিশেষে 'অনুকরণ শব্দ' বলিয়াও থাকি। আর, বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহুবিধ নামে উল্লেখ করিয়া থাকি।

শব্দ মাত্রেরই স্বভাব এই যে, উহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন হইবা-মাত্র, ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতার নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ করে এবং কোন

প্রকার না কোনপ্রকার ক্রিয়ার বা জ্ঞানের আধান করে। তন্মধ্যে, যে সকল শব্দ কেবলমাত্র শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি বৈকারিক ভাবের আধায়ক হয়, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না অর্থাৎ যাহা মানব-মনে কোন প্রকার পদার্থের ছবি সংলগ্ন করিতে পারে না, সেই সকল শব্দ ধ্বনি জাতীয় এবং ইহারই অবান্তর জাতি 'অনু-করণ'। মুরজ, মৃদঙ্গ, কাংস্য, করতাল, তূরী, ভেরী প্রভৃতির শব্দ এই ধ্বনি-জাতীয় এবং অস্মদাদির নিকট পাশব-শব্দও ঐ ধ্বনি-জাতীয়। মনুষ্যকণ্ঠ-বিনির্গত শব্দ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংস্কারপূর্ব্বক নির্গত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দও পাশব শব্দের ন্যায় ধ্বনি-জাতীয় হইবে। যথা—অতিবালক, অত্যুন্মত্ত ও রোগবিশেষগ্রস্ত মনুষ্যের হ্যাঁ—হুঁ—জ্ঞাঁ—জ্ঞুঁ—প্রভৃতি শব্দ। যে শব্দ বুদ্ধি পূর্ব্বক মানব কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হয় এবং অর্থের সহিত যে শব্দের সম্পূর্ণ সংস্রব আছে, অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা মানব-মনে কোনো না কোনো বস্তুর আকার [ছবি] সন্নিপতিত হয়, সেই সকল শব্দকে 'বর্ণ শব্দ' বা 'ব্যক্তশব্দ' বলা যায়। এই অসীম-মহিমান্বিত বর্ণশব্দ দ্বারা কবিরা গ্রাম, নগর, পল্লী অট্টালিকা এবং সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন। বস্তুর বর্ণনা সিদ্ধি হয় বলিয়া এই জাতীয় শব্দের নাম 'বর্ণ শব্দ'। চক্ষুর্দ্বারা যেমন বস্তুর আকার প্রকার উপলব্ধি হয়, এইরূপ বাক্য-দ্বারাও বস্তুর আকার প্রকার স্বভাব প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়, বরং চক্ষু-অপেক্ষা বাক্যের গতি অধিক ব্যাপক। চক্ষু-র্দ্বারা সুখ দুঃখাদি অন্তঃপদার্থের গ্রহ [জ্ঞান] হয় না, কিন্তু তাহা বাক্যদ্বারা হয়। চক্ষুর্দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর আকার প্রবিষ্ট করান যায় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা

যায়। চক্ষুঃ কেবল নিজ-অধিষ্ঠাতার অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ-অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। বাক্য যদি স্ব-পর সাধারণকে সুখ দুঃখের ভাগী না করিত, তাহা হইলে লোক অন্যের বক্তৃতায় আপনি মোহিত হইত না এবং আপনার বক্তৃতায় আপনি অনুরক্ত বা বিরক্ত হইত না। বেদে ইন্দ্রিয়নিচয়ের বাহ্য-দর্শিতা বিষয়ে একটি মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। যথা—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নাঽন্তরাত্মন্"।

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) তাহাদিগকে হিংসা করিলেন, তদবধি তাহারা আর অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইহার ভাব এই যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বাহ্য-দর্শন সিদ্ধি হয়, অন্তঃপদার্থের দর্শন সিদ্ধি হয় না। কিন্তু—

"বাক্ বৈ সর্ব্বং বিজানাতি সর্ব্বমিদম্ বশী বিভূতিঃ।"

অর্থাৎ জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যে কিছু বস্তু আছে, তৎসমস্তই বাক্যের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বাক্য দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি সিদ্ধি হয়*। পূর্ব্ব কালের ঋষিরা যে, গুরুর নিকট হইতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, তাহা তাঁহারা বাক্য দ্বারাই করিতেন। আমরা যে সংসার চক্রে ঘূর্ণমান হইতেছি, তাহাও বাক্যের অধীন হইয়া। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় বাক্যেও একটি অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

---

* বাহ্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্যের বিষয় অধিক বটে, কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নহে। কেন না, যাহা মনের বিষয় নহে, তাহা বাক্যেরও বিষয় নহে। মন যে কিছু নির্ম্মাণ করিতে পারে, সে সমস্তই বাক্য প্রকাশ করিতে পারে, অন্য ইন্দ্রিয় পারে না, এই মাত্র বলা ইহার উদ্দেশ্য।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন "দেখা গেল না বলিয়া বস্তুর অভাব অবধারণ করা উচিত নহে; কারণ, অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ করিয়া থাকি। যুক্তির অধিকারে আসিল না বলিয়াও অভাব-অবধারণ করা সঙ্গত নহে, কারণ, যুক্তি যাহার ছায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ঈদৃশ কত শত পদার্থ আমরা কত কত সময়ে একমাত্র বিশ্বস্তপুরুষের বাক্যদ্বারা লাভ করিয়া থাকি *। মনে কর, যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জিত সত্যবক্তা পুরুষ আমাদিগকে বলেন যে "অমুক স্থানে অমুক বস্তু নিপতিত আছে"। বলিলে, আমাদিগের যদি সেই বস্তুতে আবশ্যক থাকে এমত হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমরা সেই বস্তু আহরণের নিমিত্ত ধাবিত হইব। অতিবিশ্বস্তা জননী যদি বলেন "জাও—অমুক স্থানে তোমার ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত আছে।" জননী এই কথা বলিলে, তৎকালে যদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমরা তদ্দণ্ডে তদীয় উপদিষ্ট স্থানে গমন করিব; কেন না, ঐ বিশ্বস্তবাক্য শুনিবামাত্র আমাদিগের এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, "বস্তু তথায় অবশ্য নিপতিত আছে" "ভোজ্য অবশ্য প্রস্তুত আছে।" ঐ বাক্য শ্রবণের পূর্ব্বে আমাদের ঐ জ্ঞান জন্মে নাই—জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, ওরূপ জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয়, কি যুক্তি, কাহারও নাই। এই মুহূর্ত্তে দিল্লীতে কি রূপ ঘটনা উপস্থিত আছে—তাহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে? যদি

---

* "অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিভিরিব বহ্নেঃ"। [কাপিল সূত্র]
"অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতি রনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥" [ঈশ্বর-কৃষ্ণ]

মানব জাতির স্বভাবতঃ সে সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে আর লিখন পঠন পদ্ধতির উদয় হইত না, সংবাদ পত্রেরও আবশ্যক থাকিত না। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় এবং তৎসম্বন্ধ-সম্মুখ যুক্তির ন্যায়, সত্য বাক্যেও একটি অকাট্য প্রামাণ্য আছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায়, যুক্তির ন্যায়, সত্যবাক্যও একটি প্রমাণ বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ।

বাক্যের প্রামাণ্য থাকা যদি স্বীকার্য্য হইল—তবে তাহার সত্যা-সত্যের রূপ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু, বাক্য মাত্রই সত্য হইতে পারে না, বা বাক্য সম্মুখ জ্ঞান মাত্রই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে ও যৌক্তিকজ্ঞানের মধ্যে, যেমন শত শত ভ্রম লুকায়িত থাকে, শাব্দ-জ্ঞানের [বাক্য জন্য জ্ঞানের] মধ্যেও তেমনি ভ্রম থাকিতে পারে, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ন্যায় এবং যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের ন্যায়, শব্দ ও শাব্দ-জ্ঞানেরও পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। সেই আবশ্যকতা বিধায় কাপিল শাস্ত্রে উহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।" অর্থাৎ উপদেশাত্মক আপ্ত-বাক্যের নাম 'শব্দ' এবং সেই শব্দ-শ্রবণের সমনন্তর যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই 'শাব্দ-জ্ঞান'। এই শাব্দজ্ঞানও অব্যভিচারী ও অভ্রান্ত।

এখন জিজ্ঞাস্য হইবে যে "আপ্তশব্দের অর্থ কি? এবং বাক্যেরই বা আপ্ততা কি?"—

কাপিল-মতানুসারীরা বলেন 'আপ্ত' শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি জৈবিক-দোষের আশঙ্কা নাই, তাহাই আপ্তবাক্য।

সেশ্বর-সাংখ্য ও ঔপনিষদ আচার্য্যেরা বলেন, আপ্ততা বাক্যের নহে, আপ্ততা পুরুষের। জীব, ভ্রম-প্রমাদ-ইন্দ্রিয়াপাটব [ইন্দ্রিয়ের

দোষ] বিপ্রলীপ্সা [প্রতারণেচ্ছা] প্রভৃতি কতকগুলি সহজাত দুষ্ট দোষে দূষিত থাকে। যে পুরুষে ঐ সকল জৈবিক দোষের অভাব আছে, সেই পুরুষই আপ্ত পুরুষ এবং তদীয় বাক্যের নাম 'আপ্ত-বাক্য'। এই আপ্ত পুরুষ যাহা উপদেশ করেন, তাহা সত্য, অভ্রান্ত ও অব্যভিচারী। আপ্ত-পুরুষ যে কিছু বলেন, তৎসমস্তই সত্য বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, প্রামাণ্য সেই অংশেই বাস করে; অপরাংশ তাহার অনুগত হইয়া সেই প্রামাণ্যের বা উপদিশ্যমান অংশের উত্তেজনা করে। [উদাহরণ পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে]

জগতে এমন আপ্ত-পুরুষ কে আছে—যাঁহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত দোষের সম্পর্ক নাই ?

সেশ্বর-সাংখ্য ও ঈশ্বরানুগত অন্যান্য দার্শনিক পুরুষেরা বলেন, এক আপ্তপুরুষ ঈশ্বর, আর আপ্তপুরুষ যোগজ-সামর্থ্যবান্ উৎকৃষ্ট সত্ব যোগি পুরুষ [যোগসামর্থ্যে যাঁহাদের আত্মা দোষসম্পর্ক শূন্য হইয়াছে] ইহঁাদের উপদেশ কদাচ অসত্য হয় না। ইহঁাদের উপদেশের উপর সম্পূর্ণ আস্থা নির্ভর করা যাইতে পারে। পরন্তু প্রাকৃতিক মনুষ্যের উপদেশের উপর কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিক্ষেপ করা যাইতে পারে না।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, ঈশ্বরের বাক্যই হউক—আর যোগি-পুরুষের বাক্যই হউক—যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা-অনুসারে উচ্চারিত না হয় এবং যাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না,—সে বাক্যের আপ্ততা কস্মিন্ কালেও নাই। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা,—এই সম্বন্ধত্রয়, আর তাৎপর্য্য, যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে তাহারই বাক্য 'আপ্ত বাক্য' হইবে, তাহারই বাক্যে বিশ্বাস

নিক্ষেপ করা যাইবে, নচেৎ উক্ত-সম্বন্ধত্রয় রহিত অর্থাৎ অসম্বদ্ধ ও তাৎপর্য্য শূন্য ঈশ্বরের বাক্যেও বিশ্বাসস্করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে আকাঙ্ক্ষা কি? যোগ্যতা কি? আসত্তিই বা কি?— এতদ্বিষয়ে মনোযোগ কর—

আকাঙ্ক্ষা,—একটি শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থ-সম্পূরণের নিমিত্ত যে শব্দান্তরের সংযোজন করার আবশ্যক হয়, সেই আবশ্যক-ভাবের নাম আকাঙ্ক্ষা। যথা 'রাম' বা 'রামের' এবম্প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, রাম বা রামের কি?—এই রূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। ইহারই নাম আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি করিবার নিমিত্ত, ঐ উচ্চারিত বাক্যের অবয়বে 'আছেন' বা 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যক হয়। কখন কখন বাহিরে ঐরূপ শব্দ-সংযোজন বা উচ্চারণ করিবার আবশ্যক হয় না, মনে মনে উদয় হইয়াই উহা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

আসত্তি,—যতগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি বস্তু বোধক বাক্য নির্ম্মাণ করিতে হইবে—সেই সমস্ত শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ রাখিয়া, পর পর বিনা-বিলম্বে উচ্চারণ করার নাম আসত্তি। এই আসত্তিই বাক্যার্থ বোধের কারণ। শব্দ সকল আসত্তি-ক্রমে উচ্চারিত না হইলে অর্থাৎ আজ্ বলিলাম 'রাম' আর কাল বলিব 'আছেন' এরূপ ব্যবহিত উচ্চারণ করিলে তাহা কোন অর্থের প্রকাশক হইবে না।

যোগ্যতা,—আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-অনুসারে শব্দরাশি উচ্চারণ করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পাইবে, কিন্তু সেই প্রকাশ্য-মান অর্থ যদি অযোগ্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে বাক্যে যোগ্যতা নাই। এতাদৃশ বাক্যকেই লোকে অযোগ্য বাক্য বলে।

কি হইলে যোগ্য বাক্য হয় ?—আর কিম্বিধ অর্থ হইলেই বা তাহাকে যোগ্য অর্থ বলা যায় ?—

যে বাক্যের অর্থ, প্রত্যক্ষ বা যুক্তির অবিরোধী—সেই বাক্যই যোগ্য বাক্য এবং তাহারই অর্থ যোগ্য অর্থ ; যথা—"এই স্ত্রী বন্ধ্যা," এই বাক্যটি যোগ্য এবং ইহার অর্থও যোগ্য অর্থ ; কেননা, ইহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তির বিরোধী নহে। যাহার অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সেই বাক্যই অযোগ্য বাক্য ; যথা—"এই ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা"—এই বাক্যটি কি যুক্তি, কি প্রত্যক্ষ,সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

তাৎপর্য্য,—বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব-বিশেষকে শাস্ত্র কারেরা 'তাৎপর্য্য' নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই তাৎপর্য্যই শাব্দ-জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। যে বাক্যের কোন তাৎপর্য্য নাই, অথবা উপলব্ধি হয় না, সে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু এক মাত্র তাৎপর্য্যের বলে যোগ্যতা বিহীন বাক্যও সাধু বলিয়া সমাদৃত হইতে পারে। মনে কর—'ইহার জননী বন্ধ্যা'—এই বাক্যটি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও বক্তার যদি ঐরূপ বলিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে—তাহা হইলে ঐ বাক্য কদাচ অগ্রাহ্য হইবে না ; ববং, উহা কোন উৎকৃষ্ট ভাবের ব্যঞ্জক হইবে। অতএব, তাৎপর্য্যই বাক্যের সার ; তাৎপর্য্য-বোধই ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণ, তাৎপর্য্য-ব্যতিরেকে বাক্যের বা বাক্যার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। ফলতঃ নিষ্কর্ষ এই যে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য,—এই চারি প্রকার সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ যে বাক্য, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য ; তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার আপ্তবাক্য এ জগতে নাই।

"আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক"—এতদ্‌ঘটিত তিনটি মত বলা হইল। এতৎসম্বন্ধে আরও মত আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। কেন না, আপ্ত-বাক্যের লক্ষণ-ঘটিত মত যতই কেন থাকুক না, সকল মতেই বেদ বাক্যের আপ্ততা স্বীকার আছে। এমন কি,তৎকালের সমস্ত আস্তিক সম্প্রদায়ই বেদের নামে শিরোনমন করিতেন।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিদিগের বুদ্ধি যতই তীব্র—যতই সূক্ষ্মবস্তুর গ্রহণক্ষমা থাকুক—দেখা যায় বেদের নিকট সকলকারই বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়াছিল। বেদের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধি যে কেন কুণ্ঠিত হইয়াছিল —কে বলিতে পরে? তাঁহারা যে বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন, করিতেন কি না অথবা কেন করিতেন? তাহা তাঁহারাই জানেন। ফল, তাঁহাদিগের লিখনভঙ্গী দেখিয়া আমাদিগকে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে তাঁহারা বেদবাক্যকে অভ্রান্তবাক্য বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু সে পক্ষে [বেদের আপ্ততাপক্ষে] যে সকল হেতুবাদ দেখিতে পাই—সে সমস্ত এক্ষণকার লোকের অশ্রদ্ধাস্কন্দিত জড়-বুদ্ধিতে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় সুতরাং সে সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া এক্ষণে লেখনী ক্ষয় করা বৃথা। তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় যে, ঋষিদিগের লেখা দেখিয়া বোধ হয়, ঋষিদিগের বিশ্বাসে ও সিদ্ধান্তে "বেদ অপৌরুষেয়—বেদ অস্মদাদির ন্যায় কোন প্রাকৃতিক মনুষ্যের যাদৃচ্ছিক রচনা বাক্য নহে।"

আশ্চর্য্য! অস্মদাদির মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে যে সকল তর্কের উদয় হয়, ঋষিদিগের মনেও সেই সমস্ত বিতর্কের উদয় হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা আমাদের ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব শঙ্কা

করেন নাই; প্রত্যুত, পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষই সুস্থির করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে যে সকল আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল, তত্তাবতের মধ্য হইতে দুটি চারিটি আশঙ্কা মাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, দৃষ্টি কর—

'বেদ অপৌরুষেয় নহে'—'কঠাদি ঋষিরাই উহার প্রণেতা'—'বৈদিক মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ-গুলি যখন ঋষিদিগের নাম-ধাম-কার্য্য কলাপাদি ঘটিত, তখন ঋষিরাই বেদের রচয়িতা'—'আদিম কালের ঋষিরা সময়ে সময়ে যে সকল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ঘটনা বা ব্যাপারানুসারী মনোভাব সকল বর্ণন দ্বারা ব্যক্ত করিতেন, কালক্রমে সেই সকল বাক্য 'বেদ' নামে পরিগণিত হইয়াছে, সুতরাং বেদ পুরুষ নির্ম্মিত, কদাপি অপৌরুষেয় নহে'—অপিচ 'বেদ যখন কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিমাত্র, তখন উহা কোন বাগিন্দ্রিয়বান্ মনুষ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর অস্মদাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট নহেন, সুতরাং ঈশ্বর হইতে বাক্য উচ্চারিত হয় না, স্বয়ং উচ্চারিতও হয় না'—'বিশেষতঃ বেদের মধ্যে বহুতর প্রলাপ বাক্য আছে, বেদ অভ্রান্ত হইলে উহাতে প্রলাপ বাক্য থাকিবে কেন?'—'যে সকল যাগ যজ্ঞ, যে সকল ক্রিয়া কলাপ, যে যে ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও তাহার একটিতেও ফল-সংযোগ দৃষ্ট হয় না সুতরাং বেদ আপ্ত বাক্য নহে' ইত্যাদি *।

* "वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्याः" "पौरुषेयाश्चोदना इति वदाम:, सन्निकृष्टकाला: कृतका वेदा इदानीन्तना:,—कथं पुन: कृतका वेदा: ?—यत:

এইরূপে ঋষিরাও বেদের অপৌরুষেযত্ব-বিরুদ্ধে কথিতবিধ তর্ক বিতর্কের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এমন কি, কপিল ও মনু প্রভৃতি, যাঁহারা আদিমতম ঋষি, তাঁহারাও এবম্প্রকার আশঙ্কা সকল অবতারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহই পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা যে কি জন্য বেদের এত দূর পক্ষপাতী—তাহা কে বলিতে পারে? ফল, আর্য্যজাতির মধ্যে যাঁহারা ঋষি নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বরং দুই এক জন ঈশ্বরাপলাপকারী ঋষি পাওয়া যাইবে—তথাপি বেদের অবমাননাকারী ঋষি এক জনও পাওয়া যাইবে না।

বেদ-শাস্ত্রের সত্যোদ্ধার প্রণালী।

ঋষিরা বেদ-পুরুষের অভ্রান্ততা ও তদীয় বাক্য-প্রতীত অর্থের অব্যভিচারিতা স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা

पुरुषाख्याः,—पुरुषेण हि समाख्यायन्ते वेदाः—काठकं, कालापकं, पैप्पलादकं, मौद्गल्यं इत्येवमादि,—कर्त्ता शब्दस्य पुरुषः कार्य्यः शब्दः"—"अनित्यदर्शनाच्च"—"जननमरणवन्तश्च वेदार्थाः,— 'बबरः प्रावाहणिरकामयत' 'कुसुरुविन्दुरौद्दालकिरकामयत' इत्येवमादयः, उद्दालकस्यापत्यं गम्यते औद्दालकिः, यद्येवं, प्राक् औद्दालकि-जन्मनो नायं ग्रन्थो भूतपूर्व्वः"— "वनस्पतयः सत्रमासत, सर्पाः सत्रमासत." इत्यादि वाक्यमुन्मत्तवाक्यसदृशः कथम्? —"जरद्गवो गायति मत्तकानि" कथन्नाम जरद्गवो गायेत्? कथं वा वनस्पतयः सर्पा वा सत्रमासीरन्?"— "न नित्यत्वं वेदानां कार्य्यत्वश्रुतेः" 'कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारार्थं केन चिद्वेदाः प्रणीताः'— "अनियतः शब्दः, कर्म्मकाले फलादर्शनात्' इत्यादि [জৈমিনি ও শবর স্বামী]।

বেদের যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন, এরূপ নহে। অর্থাৎ বেদ-বাক্য গুলি আবৃত্তি করিবা মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থই যে ঠিক্, ঋষিরা এরূপ মনে করিতেন না। তাঁহারা বলেন, "अथातो धर्म्मजिज्ञासा" "अथातो ब्रह्म जिज्ञासा"—অগ্রে বেদ অধ্যয়ন কর, পরে অধীতবেদ হইতে আপাত-লব্ধ অর্থের ধারণ কর—পশ্চাৎ সেই সকল অর্থের বিচার কর—বিচার করিলে অন্তর্লীন [লুক্কায়িত] অসত্যাংশের পরিহার হইবেক—অসত্যের পরিহার হইলেই সত্যাংশ প্রকাশ পাইবে—সেই প্রস্ফুরিত সত্যাংশ যাহা বলিবে, তোমরা তাহাই করিবে। তাহারই সত্যতা, তাহারই অভ্রান্ততা ও তাহারই আপ্ততা। বিচার-পূত অর্থের অনুসরণ করিলে মনুষ্যকে প্রতারিত হইতে হয় না, কিন্তু অবিচারিত অর্থের অনুগত হইলে মনুষ্যকে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হয় *।

বাক্যবিচার সম্বন্ধে ঋষিদিগের মনোভাব এই যে, বেদ-বাক্যই হউক—আর লৌকিক-বাক্যই হউক—কোন বাক্যই তুল্য ভঙ্গীর বা তুল্যপদ্ধতির অনুগত নহে। বাক্য মাত্রেরই ভঙ্গী, সামর্থ্য, গতি ও বিন্যাস-পরিপাটী পরস্পর বিভিন্ন। সুতরাং সেই ভিন্নতা-অনুসারে বাক্য-রাশিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অনুগত করিয়া অর্থ কল্পনা করিতে হয়। পশ্চাৎ তাহাতে তর্কসংযোগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সঙ্কলন ও ব্যবকলন করিতে হয়; তাহা হইলেই রাশীকৃত বাক্যের মধ্য হইতে সারার্থ গ্রহণের উপায় প্রকটিত হইতে পারে।

ঋষিরা বেদ-চর্চ্চা করিয়া যেরূপ পদ্ধতিতে বেদ-বাক্য সকলের

---

* "अपरीक्ष्य प्रवर्त्तमानोऽर्थं विहन्यतेऽनर्थञ्चाप्नुयात्।" [মীমাংসা ভাষ্য]

বিভাগ করতঃ অর্থ সংগ্রহ করিতেন, এস্থলে—অন্ততঃ তাহার কিয়দংশও বলা আবশ্যক হইতেছে।

রাশীভূত বেদ-বাক্য সকলকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত কর। এক ভাগ বিধি, অপর ভাগ অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার। প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি। প্রবর্ত্তক বিধি 'বিধান' নামে, আর নিবর্ত্তক বিধি 'নিষেধ' নামে বিখ্যাত। দেখিতে পাইবে যে, প্রবর্ত্তকবিধি গুলি মনুষ্যকে বিধেয় পদার্থে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যাকুল, আর নিবর্ত্তক-জাতীয় বিধি গুলি, নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে মনুষ্যকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য শশ-ব্যস্ত।

অর্থবাদও দুই প্রকার। স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। স্তুত্যর্থবাদ গুলি প্রবর্ত্তক-বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ গুলি নিবর্ত্তক-বিধির উত্তেজনা করে। এই অর্থবাদ-দ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, অনুবাদ, আর ভূতার্থবাদ। ইহার বিস্তার, সম্ভবতঃ প্রদর্শিত হইতেছে, মনোনিবেশ কর—

প্রবর্ত্তকবিধিই হউক—আর নিবর্ত্তকবিধিই হউক ;—খণ্ড বাক্যই হউক—আর আখ্যায়িকা বাক্যই হউক;—বাক্য-রাশির মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, সেই অংশের নাম বিধি। তন্মধ্যে যে বিধি কার্য্য-প্রবৃত্তির উত্তেজক, সেই সকল বিধি প্রবর্ত্তক-জাতীয়, আর যাহা নিবৃত্তির প্রয়োজক, তাহা নিবর্ত্তক বা নিষেধ জাতীয়। "কুর্য্যাৎ" করিবেক, "কুরু" কর,—"কর্ত্তব্যঃ" করা আবশ্যক,—"করণীয়ঃ" করিবার যোগ্য,—"কৃতে শুভম্ভবতি" করিলে মঙ্গল হইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্যজাত প্রবর্ত্তক বিধি-জাতীয়। আর "ন কুর্য্যাৎ" করিবেক না,—"ন কর্ত্তব্যঃ" করিও না বা করা অনুচিত,—"কৃতে নরকং

প্রয়াস্তি” ইহা করিলে কষ্ট পাইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্য সকল নিবর্ত্তক বা নিষেধবিধি-জাতীয়।

এই দ্বিবিধ বিধিকে পুষ্টি করিবার নিমিত্ত, দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত, কতক গুলি উত্তেজক বাক্য এবং উত্তেজক আখ্যায়িকা তৎসঙ্গে যোগ দেওয়া থাকে। সেই সকল অংশের নাম অর্থবাদ। বিধি যেমন দ্বিবিধ, তেমনি উত্তেজক-অর্থবাদগুলিও দ্বিবিধ। স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। “অর্থায় প্রয়োজনসিদ্ধয়ে বাদ: কথনম্”—প্রয়োজন [উদ্দেশ্য] সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া যে কিছু বলা যায়, সেই সকলের নাম অর্থবাদ। ইহারই বিভাগ স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। প্রশংসা বাক্য বা প্রশংসাবাদ, আর ঐ স্তুত্যর্থবাদ, একই কথা। আর নিন্দাবচন ও নিন্দার্থবাদ, তুল্য কথা। আরোপিত গুণ কথনের নাম স্তুতি বা প্রশংসা, আর আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা বা গর্হণা। ইহা মনে রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে “স্তুত্যর্থবাদ গুলি প্রবর্ত্তক বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ গুলি নিবর্ত্তক বিধির সহায়তা করে।” এই পোষকতা সহায়তা বা উত্তেজকতা যে কিরূপ তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

বেদ বাক্য রাজাদিগের আজ্ঞা-বাক্যের ন্যায় নহে। রাজা যেমন “ইহা কর”—“উহা করিও না” এই মাত্র বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহার আর উপায়ান্তরের উদ্ভাবন করিতে হয় না, বাক্যাড়ম্বর বা প্রয়াস ব্যয় করিতে হয় না, বেদ-বক্তার সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম খাটে না। বেদ-বক্তার সিপাই নাই—শাস্ত্রীও নাই। তিনি কাহাকে মারিতে পারিবেন

না, ফাটক দিতেও পারিবেন না। অথচ তাঁহাকে তত্তৎকার্য্যে আবদ্ধ রাখিতে হইবে—প্রত্যেক উপদেষ্টব্য বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইতে হইবে। তিনি কি করেন, "কর" বা "করিও না" এই মাত্র বলিলে, পাছে কেহ তাহা না শুনে, এই ভয়ে অগত্যা তাঁহাকে সমস্ত উপদেশ গুলিকে ফলাফল সংযুক্ত করিয়া স্তুতি নিন্দা বা পুরস্কার তিরস্কার পরিপূর্ণ করিয়া উপদেশ করিতে হইয়াছে। বাক্যের শক্তি, কিরূপে বাক্য বা বাক্যবিন্যাস দ্বারা তাৎকালিক লোকদিগকে কতদূর বশীভূত করা যায়—ভুলান যায়—মোহিত করিয়া রাখা যায়—তাহা তাঁহারা যেরূপ বুঝিতেন, তদনুসারেই তাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। অতএব যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, বা অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, তত্তাবতের লিখিত ফলাফল যে সমস্তই ঠিক্ হইবে, এরূপ নহে। কেন না, উপদেষ্টব্য বিষয়ে ফলাফল সংযোগ করা কেবল লোকের তত্তৎকার্য্যে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" মনুষ্যের কার্য্যপ্রবৃত্তিতা ও অকার্য্য-নিবৃত্তিতা সাধনের নিমিত্তই ফলের উল্লেখ করা হয়।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ড-লড্ডুকম্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥" [মীমাংসা গ্রন্থ]

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা শিশু সন্তানকে তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান, প্রজাবর্গের কুশলকামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞান প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি ও অকার্য্য হইতে নিবৃত্তি রাখিবার চেষ্টা পান। তিক্ত ভোজন করা হইলে পিতা যেমন বালককে মোদক প্রভৃতি স্বীকৃত-লোভ্য বস্তু প্রদান করেন না, শাস্ত্রও তেমনি উপদিষ্ট

কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। যেমন পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক, তেমনি শাস্ত্রেরও ইচ্ছা প্রজা সকল শান্তি লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে পুত্র যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক পায় না, সেইরূপ, শাস্ত্রের প্ররোচনায় মনুষ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে গমন করিলে বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার না কোন প্রকার কুশল লাভ করে, অন্য ফল পায় না। "প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং নাশ্নীয়াৎ" প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক না। এই একটি বিধি অর্থাৎ উপদেশাত্মক বাক্য। পাছে কেহ এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অকুশলী হয়, এই ভয়ে শাস্ত্র, উহার গাত্রে একটি নিন্দার্থবাদ সংলগ্ন করিয়া দিলেন "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃস্যাৎ" যে প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক, তাহার অর্থ বিনাশ হইবে। বস্তুতঃ কথিত সিদ্ধান্তের অনুসারে বুঝিতে হইবে যে ঐ অর্থবাদ বাক্যটি কেবল প্রতিপত্তিথিতে লোকদিগকে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র, কুষ্মাণ্ড-ভোক্তার অর্থ বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে না। ফলতঃ উক্ত উপদেশ বাক্যের মর্ম্ম এই যে, প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে বাস্তবিক কোন অপকার না হউক, ভক্ষণ না করিলে শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার না কোন প্রকার উপকার আছে।

প্রভুর আজ্ঞা বাক্যের উপর ভক্ত-পুরুষের অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকায় তাহারা যেমন প্রভুবাক্য সকল শিরোধার্য্য করতঃ বহন করে—সেইরূপ, শাস্ত্র-ভক্ত ব্যক্তিরা যেন উক্ত কথার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস নিহিত করিয়া কুষ্মাণ্ডভোজনে নিবৃত্ত থাকিলেন, কিন্তু যাঁহারা

শাস্ত্রের ভক্ত নহেন, অনুগত নহেন, তাঁহারা কেন নিবৃত্ত থাকিবেন? বরং তাঁহারা এই বলিয়া শাস্ত্রকে অনুযোগ করিবেন যে, "শাস্ত্র উক্ত তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণাভক্ষণের দোষ গুণ অবগত আছেন কি না সন্দেহ?—যদি থাকেন, গোপন করিবার প্রয়োজন কি?—তোমরা স্বচ্ছন্দে কুমড়া থাও—খা্‌লে কি হইবে? কিছুই হইবে না—উহা কেবল বোকা ভুলান কথা মাত্র"।

পরভাবী অশ্রদ্ধালু তর্কদাস তপ্তশোণিত ভবিষ্যৎ-পুরুষেরা যে শাস্ত্রকে এই বলিয়া তিরস্কার করিবে—শাস্ত্র তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। কারণ, ঐ রূপ অনুযোগ বাক্য লক্ষ্য করিয়া নানা শাস্ত্রের নানা স্থানে কটাক্ষ-ক্ষেপ দৃষ্ট হয়*। ফল, খাদ্যাখাদ্যের সহিত শরীরের, মনের, জ্ঞানের, ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সে সমস্ত প্রদর্শন করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং তাহা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং তাহা পরিত্যক্ত হইল,—পাঠক বর্গ ক্ষমা করিবেন।

তিষ্ঠতু। লোক মধ্যে এই এক স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে "ভাল লোকে যাহা উপদেশ করে—তাহার কোন ভাল ফল আছে। আর যাহা নিষেধ করে, তাহার কোন মন্দ ফল আছে"। এই লৌকিক সিদ্ধান্তের অনুসারেই বৈদিক বাক্যের সিদ্ধান্ত হয়। সাধু মনুষ্যেরা যেমন লোককে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ ফলের উল্লেখ,

---

* পূর্ব্বকালের দুই একটি বিধি-নিষেধের মর্ম্ম এক্ষণকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কল্পনা দ্বারা বাহির করিতেছেন। ১৭৯৪। ৯৫ শকের তত্ত্ববোধনীপত্রিকায় "আর্য্য ঋষিদিগের তাড়িত্ বিষয়কজ্ঞান" শীর্ষক প্রস্তাবে কতক গুলি তার প্রকাশিত হইয়াছে এবং অন্যান্য সময়ে অন্যান্য প্রকার শাস্ত্রীয় মর্ম্ম অনেক প্রকটিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

ঘটনার আখ্যান, আখ্যায়িকার রচনা, দৃষ্টান্ত স্থলের উদ্ভাবন করেন ; শাস্ত্রও ঠিক্ সেই রূপ করেন। তন্মধ্যে উপদেশাত্মক অংশই যেমন লোক-বাক্যের সার, সেই রূপ শাস্ত্র-বাক্যেরও সার উপদেশ। বাক্য-রাশির মধ্যে উপদেষ্টব্য অংশের পোষকতাকারী ঘটনা বা আখ্যায়িকাত্মক বাক্যান্তর গুলি যেমন কদাচিৎ সত্যও হয়, কদাচিৎ মিথ্যাও হয়, বেদ-বাক্যেরও ঠিক্ সেই রূপ হয়। এই বিবেচনায় ঋষিরা, উপদেশাত্মক শাস্ত্র ভাগের উত্তেজক ঘটনাখ্যান, ইতিহাস বর্ণন, বা বস্তুশক্তি কথন রূপ আর্থবাদিক অংশ সকলকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় এবং সত্যাসত্যের অবধারণ করিতেন। সেই তিন প্রকারের এক প্রকারের নাম গুণবাদ, দ্বিতীয় প্রকারের নাম অনুবাদ, তৃতীয় প্রকারের নাম ভূতার্থবাদ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহারই মর্ম্ম প্রকট করা যাইতেছে।

গুণবাদ—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ" যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ-বা যুক্তি-বিরুদ্ধ পদার্থের বা ঘটনার সংশ্রব দৃষ্ট হইবে, তাহার নাম গুণবাদ। এই গুণবাদ-জাতীয় অর্থবাদের বর্ণনীয় অক্ষরার্থ অংশ অসত্য ; কেন না উপদেশ্য বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি উৎপা-দনের নিমিত্তই ইহার জন্ম সুতরাং উপদেশ্য বিষয়ের প্রশংসা করাই ইহার সত্য।

অনুবাদ—"অনুবাদোঽবধারিতে" যে অর্থবাদ কেবল বিজ্ঞাত বিষয়েরই কথা বলে, তাহার নাম অনুবাদ। এই অনুবাদ-জাতীয় অর্থবাদের লক্ষ্যাংশ ও বর্ণনীয় অংশ উভয়ই সত্য। যদিও বিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ করা নিষ্প্রয়োজন, তথাপি তাহার কোন স্বতন্ত্র ফল আছে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যেখানে যেখানে তাদৃশ বর্ণনা বা উপ-

দেশ আছে, সেই সেই স্থানে অবশ্য কোন প্রকার স্বতন্ত্র অপরিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ আছে বুঝিতে হইবে।

ভূতার্থবাদ— "ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ" যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ বা যুক্তি বিরুদ্ধ কথা নাই, বিজ্ঞাত বিষয়েরও প্রতিপাদন নাই, ঈদৃশ অর্থবাদের নাম ভূতার্থবাদ। এই ভূতার্থবাদ-জাতীয় অর্থবাদকে অসত্য বিবেচনা করা মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য।

এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যের বা লোক-বাক্যের বিবিধা গতি, শাস্ত্রের স্থানে স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত বাক্যের ও উভয়ের সহিত মানব মনের বা মানবীয় জ্ঞানের কিরূপ সম্বন্ধ—বাক্যের শক্তি মনুষ্যের মনে কতদূর প্রভুত্ব করিতে পারে—তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। সে সকল উদ্ঘাটন করা অস্মদাদির অসাধ্য। ফল, এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মা গতি অবলম্বন করিয়া আর্য্যেরা বেদ বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতেন। তাহাতে যেরূপ জ্ঞান লাভ হইত, তাহাকে অব্যভিচারী মনে করিয়া তদনুসারেই চলিতেন, এবং অন্যকেও উপদেশ দিতেন, কদাচ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না।

বেদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রস্তাব আছে, ঋষিরা বলেন যে, ছয় প্রকার উপায় দ্বারা তত্তাবতের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত হয়। যথা—উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য (১), অভ্যাস [পুনঃ পুনঃ উল্লেখ] (২), উপক্রান্ত [যাহা প্রস্তাব আরম্ভের ভিত্তি] পদার্থের অপূর্ব্বতা অর্থাৎ অজ্ঞাততা [অন্যপ্রকারে যাহা জানা যায় নাই] (৩), উপক্রান্তের সহিত ফল সম্বন্ধ (৪), উপক্রান্ত পদার্থে রুচি জনক অর্থবাদ (৫), তর্ক দ্বারা উপক্রান্ত পদার্থের সংশোধন (৬)। যে পদার্থ লইয়া প্রস্তাবের আরম্ভ হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও যদি সেই বস্তুর

উল্লেখ থাকে, প্রস্তাবের মধ্যে মধ্যে যদি সেই পদার্থের অনুবাদ হইয়া থাকে, বারংবার উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ যদি ফল-প্রদ বলিয়া বর্ণিত হয়,—এবং অর্থবাদ-বাক্য গুলি যদি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বোধ হয়, তর্কদ্বারা সেই পদার্থই সংস্কৃত হইয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে যদি এরূপ প্রতীতি হয়,—তাহা হইলে সেই পদার্থের উপদেশ করাই সেই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য বিবেচনা করিতে হইবে*।

এই সকল বিচার পদ্ধতি ও এতদ্ভিন্ন অনেকানেক বাক্-ভঙ্গি-প্রকাশ, বৈদিক রচনার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণের রচনাও এই পরিপাটী ক্রমে হইয়াছে। বেদের মধ্যে যেমন অনেক অসম্ভব গল্প-কথা আছে, পুরাণের মধ্যেও ঠিক্ সেইরূপ আছে। অসঙ্গত রচনা দেখিয়া পুরাণকে আমরা উপেক্ষা করি, কিন্তু ঋষিরা তাদৃশ বা তদধিক অসঙ্গত দেখিয়াও বেদকে অবজ্ঞা করিতেন না, প্রত্যুত বিচার মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ পূর্ব্বক সত্যাংশের আদান ও অসত্যাংশের পরিহার করিতেন। অসত্যাংশকে একেবারে হেয় জ্ঞান না করিয়া তাহা সত্যাংশের উপকারক মনে করিতেন। ঋষিরা যেমন বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহের নিমিত্ত ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান্ ও বিচারনিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেই রূপ হইতাম, উপেক্ষাত্মিকা বুদ্ধি যদি আমাদের প্রবলা না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমরাও পুরাণাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতাম।

* "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" [বেদান্ত বার্ত্তিক]

"পুরাণ" এই শব্দটি বৈদিক শব্দ। অতএব, ব্যাস বা তদুত্তর-কালিক পণ্ডিতগণ হইতেই যে পুরাণের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত মনে রাখা অকর্ত্তব্য। ভঙ্গি-বিশেষের ব্রাহ্মণাত্মক বেদ ভাগকে পুরাণ বলে। আধুনিক পুরাণ সকল তাহারই অনুকরণ মাত্র। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপ বেদার্থের স্মরণাত্মক ঋষি-বিরচিত গ্রন্থের নাম স্মৃতি [বেদের অর্থ স্মরণ রাখিয়া যাহা রচিত] আর বৈদিক পুরাণের পদ্ধতিতে, লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ঘটনাবলী প্রকাশক ঋষি বিরচিত গ্রন্থের নাম পুরাণ। *

সম্প্রতি ঔপদেশিক জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে করিতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব, এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক অভ্যাগত বুদ্ধির শেষ করা গেল।

আর্য্যশাস্ত্রের মতে, বিশেষতঃ কাপিল শাস্ত্রের মতে, প্রমাণ নিচয়ের মধ্যে আপ্ত-বাক্য স্বতঃপ্রমাণ। চক্ষুঃ যেমন স্বতঃপ্রমাণ, সেইরূপ স্বতঃপ্রমাণ; অর্থাৎ উহা প্রমাণ কি না? তাহা আর পরীক্ষা করিতে হয় না। এই প্রমাণ-পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের অব্যভিচারিতা সর্ব্ব কালেই আছে। বাক্যের আপ্ততা সম্বন্ধে যে কিছু মত আছে—সে

---

* "যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী" [ঋগ্বেদ ভাষ্য ধৃতা শ্রুতি] অমানব প্রাচীন ঘটনাবলীর বিবরণাত্মক বেদ ভাগের নাম ইতিহাস—জগতের বা জগতীস্থ বস্তু জাতের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ ভাগের নাম পুরাণ—যাগ যজ্ঞাদি ঘটিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নির্ণয়াত্মক বেদ ভাগের নাম কল্প—প্রশংসা সূচক গানোপযোগী বেদ ভাগের নাম গাথা—মনুষ্য বৃত্তান্ত প্রতিপাদক বেদাংশের নাম নারাশংসী। এইরূপ, বেদের মধ্যেই সমস্ত আছে। আধুনিক পুরাণাদির রচনাপদ্ধতি ও নামকরণ, উক্ত বৈদিক পুরাণাদির অনুসারেই হইয়াছে। তবে কি না আধুনিক পুরাণ সমুদায়ে বৈদিক পুরাণ অপেক্ষা সমধিক বর্ণনা ও অস্ফুট ভঙ্গী বিস্তর পরিমাণে আছে।

সমস্ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফল, সকল মতেই বেদ বাক্যের আ-প্তুতা স্বীকার আছে। বাক্য-বিচারের যে প্রকার রীতি-পদ্ধতি প্রদর্শন করা হইল, তদনুসারে বিচারিত বেদ-বাক্য যে জ্ঞান প্রসব করিবে, সেই জ্ঞান অভ্রান্ত অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। লৌকিক বাক্যেও বিচার সং-যোগ করার আবশ্যকতা আছে। তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তদনুসারে বিচারিত-লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। তবে প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য কেবল ঐহিক ব্যবহারের যোগ্য পদার্থের প্রতিপাদন করে, আর বৈদিক বাক্য সকল দৃশ্যাদৃশ্য ও ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ পদার্থেরই প্রতিপাদন করে, কিন্তু বেদ-বাক্যের কিছু অদৃশ্য ও পারত্রিক কুশলের দিকেই সমধিক পক্ষপাত দৃষ্ট হয়।

অপিচ, বাল্যকাল হইতে শব্দের শ্রবণ, কার্য্যের দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতির মনন, ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মনুষ্য, শব্দ-রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে অর্থ-প্রত্যায়ক বিচিত্র শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহার পরিচয় পাওয়ার নামব্যুৎপত্তি *। এই

---

*"ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ" "সিদ্ধিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ" [কাপিল সূত্র] ব্যুৎপত্তি [সংস্কারবিশেষ] জগ্মান একটি জ্ঞান-সামান্যের এবং কোন কোন বিশেষ জ্ঞানের কারণ। এমন জ্ঞান অনেক আছে, যাহা ইন্দ্রিয়, যুক্তি, বা উপদেশ দ্বারা জন্মে না। কেবল ব্যবহারাধীন উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হয়। এই ব্যবহারাধীন সমুৎপন্ন জ্ঞানের কতকগুলি ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি বা ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সে গুলিকে আমরা ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। যথা ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের মধ্যে দূরত্বাদি জ্ঞান। এই দূরত্ব জ্ঞানটি কোন প্রমাণ নিষ্পন্ন নহে। উহা ব্যবহার-সমুৎপন্ন। ব্যবহার সমুৎপন্ন হইলেও আমরা উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানি না, ঐন্দ্রিয়ক বলিয়াই বিবেচনা করি। দূরত্ব, উচ্চত্ব, নীচত্ব, একত্ব

বুৎপত্তিমান্ পুরুষই বিচারের অধিকারী। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, কর্ণাপাটব প্রভৃতি জৈবিক দোষ রহিত কথিতবিধ অধিকারি-ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক যাহা বলেন, তাহা সত্য। এতদ্ভিন্ন সাংখ্যমতে বিচারিত বেদ বাক্য এবং যোগি-পুরুষের * বাক্যও সত্য সুতরাং তৎসমুথ জ্ঞানও সত্য। এতাদৃশ সত্য বাক্যের নাম উপদেশ, আর তজ্জন্য জ্ঞানের নাম ঔপদেশিক জ্ঞান।

এতাদৃশ ঔপদেশিক জ্ঞান সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তির কারণ এবং এতাদৃশ উপদেশ ভ্রম, প্রমাদ, অজ্ঞান, সংশয়, সর্ব্বপ্রকার দোষ নিবৃত্তির হেতু।

শিশুকাল হইতে জ্ঞান সঞ্চয় আরম্ভ করিয়া আমরা যে ভবি-

চক্ষুঃ কি অন্যকোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, সুতরাং উহা ইন্দ্রিয় সম্ভূত জ্ঞান নহে। তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে "এতদূর" "এত উচ্চ" যেন চক্ষে দেখিতেছি। ফলতঃ, ঐ সকল জ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারাধীনই উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আরব্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা ব্যবহারাধীন জন্মে বলিয়া, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকদিগের 'এত দূর' 'এত উচ্চ' জ্ঞান থাকা দৃষ্ট হয় না। এই রূপ, সঙ্কেতাদি ব্যবহার সমুথ জ্ঞানও যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে এবং এ শব্দের এই শক্তি, এইরূপ বলিলে ঐ রূপ বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে নিবিষ্ট আছে। কপিল বলেন, আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ পরম্পরায় বস্তুর ব্যবহার ও জ্ঞাত-শব্দের সামানাধিকরণ্য, এই তিনটি মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের কারণ। তদ্ভিন্ন চতুর্থ কারণ নাই। এ সকলের অনেক বিস্তার আছে, কিন্তু সে সকল বলিতে গেলে অনেক বাহুল্য হইয়া উঠে বলিয়া ক্ষান্ত থাকা গেল।

* সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রের মত এই যে, যোগাভ্যাস করিতে করিতে মনুষ্যের এক প্রকার সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। তদ্বলে তাঁহারা ত্রিকালদর্শী ও যথাভূত অর্থের জ্ঞাতা হন। যোগাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের রজ তম অংশ অর্থাৎ জড়তা, অপ্রকাশ ও বিক্ষেপ প্রভৃতির কারণীভূত পদার্থ সকল অবিভূত হয় এবং তদ্বলে অন্তঃকরণ প্রকাশময় হইয়া উঠে সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কোন বস্তুই আবৃত থাকিতে পারে না।

ষ্যতে জ্ঞান বৃদ্ধ হইবার আশা করি—তাহাও উপদেশের বা আপ্ত বাক্যের মহিমা। যদি চক্ষুঃ, কর্ণ,নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকে, আর একমাত্র বাক্-ব্যবহারের অভাব হয়; যদি জগতের কোন লোক কিছুমাত্র না শুনে, না বলে, তাহা হইলে আমরা চক্ষুঃ থাকিতেও অন্ধ, ইন্দ্রিয় থাকিতেও নিরিন্দ্রিয় প্রায় হইয়া যাই সন্দেহ নাই। অধিক কি, বাক্য-ব্যবহার না থাকিলে আমাদের কোন জ্ঞানই সঞ্চারিত ও পরিষ্কৃত হইত না। যদি সদ্য-প্রসূত বালককে বিজন অরণ্যে রাখা যায়—তাহা হইলে তাহার যেরূপ জ্ঞান সঞ্চয় হয়—তাহা পাঠকগণ ভাবিয়া দেখুন। ইহ সংসারে যদি সকল মনুষ্যই যুগপৎ বাগিন্দ্রিয় বিহীন হয়—তাহা হইলে সংসারের দশা কি হয় তাহাও মনে করিয়া দেখুন।

* মনে কর,যে কখন 'অশ্ব' এই বাক্য শুনে নাই—কীদৃশ বস্তু-কে 'অশ্ব' বলে তাহা জানে নাই—ঈদৃশ অগৃহীত-শব্দার্থ-সঙ্গতিক পুরুষের চক্ষুর উপর অশ্ব রাখিয়া দিলেও যতক্ষণ না কোন বিশ্বস্ত পুরুষ বলিবে যে 'এই অশ্ব'—ততক্ষণ তাহার অশ্ব জানা হইবে না। পূর্ব্বে যদি লিপি বা বিশ্বস্তবাক্যের দ্বারা অশ্বের লক্ষণ জানা থাকে—তবে তাহা না বলিলেও কথঞ্চিৎ চলিতে পারে। অতএব, পদার্থ চিনিবার প্রধান উপায় বাক্য, বিশেষতঃ বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান, বৈদান্তিক দিগের ব্রহ্মজ্ঞান, সমস্তই আপ্ত-বাক্যের উপর নির্ভর করে দেখিয়া ঋষিরা

---

* "यथा दृष्ट-गो-पिण्डस्यापि अगृहीतशब्दार्थ सङ्गतिकस्य अयं गौरिति वाक्यादेवाऽवगमस्तु न चक्षु तेन विषयीकृतेऽपि गो-पिण्डे गो-बुद्ध्युत्पत्तिः"। [মহাবাক্য বিচার]।

বাক্যকে চক্ষু অপেক্ষাও গুরুতর প্রমাণ মনে করিতেন। এই জন্যই ঋষিদের নিকট বাক্যের অত সম্মান। আপ্তবাক্যে যে অথণ্ড প্রামাণ্য আছে এবং সেই অথণ্ডপ্রামাণ্যযুক্ত আপ্ত বাক্য কি না বেদ ;—এই বেদবাক্য এবং বেদার্থ মনন-শীল যোগি-পুরুষদিগের বাক্য ঋষিদিগের নিকট অতি মান্য। তাঁহাদের মতে বাক্য, কি ইহ লৌকিক কি পারলৌকিক, কি তাত্ত্বিক কি পারমার্থিক,—সর্ব্ববিধ পদার্থেরই প্রকাশক।

এত দূরে পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি সমাপ্ত করা হইল। এক্ষণে পরীক্ষিতব্য বিষয়ের নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

---

*সৎকার্য্যবাদ।

"নাঽসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।"

[কাপিল সূত্র]

[illegible]পে প্রমাণ পরীক্ষা সমাপ্ত করা হইয়াছে। † সম্প্রতি প্রমাণের বিষয়] পরীক্ষা উপস্থিত। ইহাও সংক্ষেপে

---

* "অস্তীতি প্রতীতিবিষয়ং সৎ" যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহারই নাম সৎ ('আছে' এই জ্ঞান প্রমা জ্ঞান হওয়া আবশ্যক) সৎ ও সত্য একই কথা। সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বা অসত্য। যাহার রূপ নাই, আখ্যা নাই, যে স্বয়ংও নাই, তাহার নাম অভাব বা অসত্য। যথা—নরশৃঙ্গ, শশবিষাণ, বন্ধ্যা পুত্র ইত্যাদি।

† পূর্ব্বে তিনটি মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। যদিও মতবিশেষে অধিক প্রমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উল্লেখ মাত্র। সাংখ্য মতে "নান্যূনং নাতিরিক্তম্" তিনের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, ন্যূনও নাই। অলৌকিক আর্য বিজ্ঞান বা যোগি-প্রত্যক্ষ যদিও প্রমাণান্তরের ন্যায় অসাধারণ ফল প্রসব করে, তথাপি তাহা কথিত প্রমাণত্রয় হইতে ভিন্ন নহে। যোগীরা যোগ বলে, বিদেশীয়েরা যন্ত্র বলে, অতি দূরস্থ বস্তুকেও নিকটস্থের ন্যায় লক্ষ্য করেন—পরমাণু বা তত্তুল্য-সূক্ষ্ম বস্তুকেও স্থূলবৎ প্রত্যক্ষ করেন, এ কথা শুনা যায়

বক্তব্য । পরন্তু এই সৎকার্য্যবাদ অংশে প্রমেয়-মধ্যে পরিগণিত হইলেও যুক্তি-শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহাকে প্রমেয় পরীক্ষার পূর্ব্বে অবতারিত করা গেল ; কেন না, ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের প্রমেয় পরীক্ষার ভিত্তি ।

সাংখ্য মতে তাত্ত্বিক-প্রমেয় [প্রমাণের বিষয়ীভূত মূল তত্ত্ব] পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে । যদ্যপি পশু, পক্ষী, মনুষ্য,—চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা,—ঘট, পট, গহ, কুড্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয় ; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা প্রভৃতি যে কিছু

দেখাও যায় । কিন্তু তদ্বিধ দর্শনের উপায়ীভূত যে যোগ ও যন্ত্র, ইহারা স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে । তবে কি না, প্রমাণান্তরের অনুগত হইলে উহারা সেই সেই প্রমাণের সাধক হয় বটে । যোগ বা যন্ত্র, ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলে সেই [illegible]-য়ের শক্তি বৃদ্ধি করে মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুরই সাধক বা বাধক হয় [illegible] কথা মীমাংসকাচার্য্য গাগা ভট্ট বলিয়াছেন, "**স্বচ্ছদম্বাদস্নাভাস্ব[illegible] হীনা অনুগীষ্মস্যবাধকত্ব' দৃষ্টং, তদুৎকর্ষতারতম্যাদিন্দ্রিয়য়স্য [illegible] তারতম্যকারিত্বেষ্ব কল্প্যম্**" [মীমাংসা কুসুমাঞ্জলি] ।

অপিচ, যোগ ও যন্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ বর্ত্তমান আছে । যন্ত্র কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু যোগ অন্তরিন্দ্রিয়েরও শক্তি বৃদ্ধি করে । যন্ত্র, সূক্ষ্ম বস্তুর শরীরে স্থূলত্ব ভ্রম না জন্মাইয়া ঠিক্ আকারটিকে চক্ষুর্গোচর করিতে পারে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইয়া প্রত্যক্ষে উপনীত করিতে পারে না, কিন্তু যোগ তাহা পারে । [যোগের ঐ রূপ শক্তি আছে কি না, ঠিক্ বলা যায় না । তবে বুদ্ধ্যারোহ করিবার নিমিত্ত যে কিছু যুক্তি আছে, তাহা যোগ দর্শন লিখিবার কালে বক্তব্য ।]

আর এক কথা । ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এক দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়া যান । লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্দ্বারা দূরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া তত্তাবত্ত ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করিতেন । "নিকটস্থের ন্যায়" এই লিখন ভঙ্গি দ্বারা বোধ হয় যে ঐ দিব্য চক্ষুঃ কোন প্রকার যন্ত্রজাতীয় হইবে । চস্‌মা যখন দিব্যচক্ষুর নামান্তর, তখন অসম্ভবই বা কি ?

আন্তর-পদার্থ তাহাও প্রমেয়; তথাপি, তাহা প্রমেয় হইলেও তাত্ত্বিক প্রমেয় নহে। উহা ব্যবহারিক প্রমেয় *।

তাত্ত্বিক প্রমেয় কি? যাহা তত্ত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক-পদার্থ বলিয়া প্রমা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাত্ত্বিক প্রমেয়। এক মৃত্তিকা-বিকারকে ঘট, শরাব এবং উদঞ্চন প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহার করিলেও, ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া গণনা করিলেও, তাহা যেমন মৃত্তিকা হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তেমনি আন্তর ও বাহ্য-পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্যতা কল্পনা করিলেও সে সমস্তের তত্ত্ব বাস্তবিক অসংখ্য নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার কালে একবিধ; কিন্তু তাহার তত্ত্ব অন্যবিধ।

কাহারো মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম; কাহারো [illegible]তি আর পুরুষ; আবার কাহারো মতে জগতের তত্ত্ব অন্য-[illegible]ই কেন মত থাকুক না, ব্যবহারের সমসংখ্যক তত্ত্ব কোন [illegible]। ব্যবহার-ভাবের কাল্পনিকতা আর মূলের তাত্ত্বিকতা সকল [illegible]তেই আছে। ব্যবহারিক পদার্থের অসত্যভাব দেখাইবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য-ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে। ঐ আখ্যায়িকার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "পুরাকালে উদ্দালক নামে এক ঋষি, শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত গুরু-সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু, কিছুকাল পরে

---

* প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান যে যে বস্তুকে অবগাহন করে সেই সেই বস্তুই প্রমেয়। এতাবতা বস্তু, পদার্থ, প্রমেয়, এই সমস্ত নাম এক অর্থেই ব্যবহার হয়। ব্যবহারিক প্রমা এবং ব্যবহারিক প্রমেয়, ব্যবহার কালেই উপযুক্ত কিন্তু তাত্ত্বিক প্রমা ও তাত্ত্বিক প্রমেয় তত্ত্ব জ্ঞানের উপযুক্ত।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক তাহার জ্ঞান-পরিমাণ অনুভবার্থে, তদীয় মুখ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্বেতকেতুর তত্ত্ব জ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃ করণ কেবল বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্বেতকেতু তত্ত্বজ্ঞ হইয়া আসে নাই, একটি বিচারমল্ল হইয়া আসিযাছে।

উদ্দালক এতদ্দর্শনে দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন আর ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যে মনুষ্যের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি প্রবল নাই, নিজের জ্ঞান শক্তির প্রতি সংশয় নাই, সে মনুষ্যকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। অতএব, যদি কোন প্রকারে ইহার নিজ অজ্ঞানসত্তা অনুভব করান যায়—তবেই ইহার বর্ত্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপশান্ত হইতে পারিবে, নচেৎ না। উদ্দালক মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিয়া শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্বেত-কেতু! তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্তু তুমি [illegible]কোন পদার্থ জানিয়াছ যে যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয়?"—

শ্বেতকেতু বলিলেন "পিতঃ! ইহা কিরূপে সম্ভব হয়?"—

উদ্দালক বলিলেন "একটি মৃন্ময় বস্তুর মূল জানিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুই জানা হয়—একটি নখ-নিকৃন্তনের [নরুণ] তত্ত্ব জানিলে যেমন যাবৎ কার্ষ্ণায়স [তীক্ষ্ণলৌহ] পদার্থ জানা হয়—একটি হিরণ্য-কুণ্ডলের প্রকৃতি জানিলে যেমন যাবৎ হিরণ্ময় বস্তুই জানা হয়;—তেমনি এই দৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূল উপাদান জানিতে পারিলে, তৎকার্য্যভূত সমস্ত পদার্থই জানা হয়।"

উদ্দালকের এবম্বিধ উত্তরে শ্বেতকেতুর ক্রমে নিজ জ্ঞান-শক্তির প্রতি সংশয় জন্মিল, জিজ্ঞাসার উদয় হইল, বুভুৎসা প্রবল হইল।

অনন্তর উদ্দালক তর্ক সহকৃত উপদেশ দ্বারা তদীয় মনে তত্ত্ব সঞ্চার করিলেন। অতএব, ব্যবহার কালে ঘট-শরাবাদির পার্থক্য অনুভূত হইলেও তাহা তাত্ত্বিক জ্ঞানের নিকট অসত্য। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বিকার পদার্থ সকল বাক্য দ্বারাই সৃষ্ট (কল্পিত), নাম সকলের সত্যতা নাই, মূল পদার্থেরই সত্যতা। অতএব ঘট, শরাব, উদঞ্চন, —এ সকল নাম মাত্র, মৃত্তিকাই উহাদের সত্য।

এই অভিপ্রায় কেবল উদ্দালক ঋষির নহে, সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও বটে। সংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, কার্য্য-কারণভাব রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া জগতের মূল তত্ত্বে উপনীত হও—তাহা হইলে আপনার স্বরূপ ও জগতের যথার্থ রূপ অবগত হইতে পারিবে। জগৎ ও আত্মা, এই দুই পদার্থের বিবেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে।

[illegible]িক দিগের কথা গুলি শুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন ন[illegible]বা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে। সাংখ্য-[illegible]লেন "নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য কারণ ভাব অবলম্বন করিয়া মূল তত্ত্বে উপনীত হও" কিন্তু ততদূর গমন করিবার পরিষ্কৃত পথ কৈ? জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কার্য্য কারণ ভাব এমনি বিচিত্র, এমনি আশ্চর্য্য যে, নিম্নশ্রেণীর কার্য্য-কারণভাব স্থির করাও সুকঠিন। আবার মনুষ্য মনের সহিত এই জগতের এমনি বক্র-সম্বন্ধ, এমনি প্রতার্য্য-প্রতারক ভাব যে, একটা সামান্য কার্য্য কারণ ভাব গড়িতে গেলেও মত ভেদ উপস্থিত হইয়া সংশয় সাগরে নিমগ্ন করে ও বিমোহিত করে। কোন অনুকরণ ধ্বনির [যেমন ঢেঁকীর কচ্‌কচির] প্রতি মনোনিবেশ করিলে, সেই ধ্বনিকে যখন যেরূপ কল্পনা করা যায়, তখন সেই রূপই বোধ হয়। জগৎ বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয়

করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক্ সেই রূপ হয়। না হইবে কেন? যখন জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার দুইটি একরূপ পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই ওরূপ হইবে। প্রজ্ঞা, প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অত্যন্ত ভিন্ন। অতএব, যাঁহার যেমন প্রজ্ঞা, তিনি তদনুরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন। বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত যে ঠিক্, কে বলিতে পারে?—

সাংখ্যকার বলেন, নির্দ্দোষ সংস্কৃত আত্মাই উহা বলিতে পারে। যাহা ত্রৈকালিক, (কস্মিন্ কালেও যাহার অন্যথা হয় না) তর্কপরিষ্কৃত, সংস্কৃত-আত্মার বিশ্বস্ত, নিরপেক্ষ সৎপুরুষের প্রিয়, তাহাই ঠিক্। সেই ঠিক্ সিদ্ধান্তই ফল প্রসব করে। সেই সিদ্ধান্তই কল্যাণকামী পুরুষের অবশ্য গ্রাহ্য। উৎপত্তি ঘটিত কার্য্য কারণ [illegible] অনেক মত আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত মত অত্রৈকালিক, [illegible]রিষ্কৃত, সংস্কৃত আত্মার ও সৎপুরুষের নিকট অপ্রিয় সুতরাং [illegible] মত অসৎ।

এক মত আছে, "অসতঃ সজ্জায়তে" অসৎ অর্থাৎ রূপ ও আখ্যাদি-বিবর্জিতরূপ কারণ হইতে সৎ [যথার্থ বস্তু] পদার্থ জন্ম লাভ করে। এই মতের নাম অসৎকার্য্যবাদ।*

---

* ইহা ন্যায় সম্মত। এতদ্ভিন্ন নাস্তিকবিশেষের মতে অসৎ অর্থাৎ নাম রূপ আখ্যা বিবর্জ্জিত (যাহা কিছুই নহে) স্বরূপ কারণ হইতে তত্তুল্য অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে এমন এক আশ্চর্য্য কার্য্য উৎপন্ন হয়। এমতে জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, এখনও না, ভবিষ্যতেও না। ইহার মতে ঈশ্বর নাই পরকালও নাই।

আর এক মত আছে, "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সৎ" এক সদ্বস্তু হইতে এই দৃশ্যমান কার্য্য সমূহ আত্মলাভ করিয়াছে সুতরাং এ সমস্তই অসৎ অর্থাৎ ভ্রমোৎপন্ন ও ভ্রমময়। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ।

অন্য এক মত আছে "সতোঽসজ্জায়তে" পরমাণু প্রভৃতি সৎ পদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ যাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, তাহা দ্ব্যণুকাদি ক্রমে উৎপন্ন হয়। এই মতের নাম অভাবোৎপত্তি বাদ।

অপর এক মত এই যে "সতঃ সজ্জায়ত-এব" সদ্বস্তু হইতে সদ্বস্তুই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়,তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও থাকে। এই মতের নাম সৎকার্য্য বাদ। সাংখ্য প্রণেতা কপিল এই [illegible]পক্ষপাতী। মহর্ষি কপিল যুক্তি সহকারে বলিয়াছেন "পূর্ব্ব [illegible]লি সদোষ, অন্যথাভবিক, অত্রৈকালিক, সংস্কৃত-আত্মার [illegible]রাং উহা অসৎ ও অগ্রাহ্য ; কিন্তু এই মতটি [উৎ পত্তির [illegible]ার্য্য থাকে] উহার বিপরীত, সাধু ও কল্যাণ-কামী পুরুষের গ্রাহ্য। আমরাও সাংখ্যপক্ষপাতী সুতরাং এই মতই বিবৃত করা যাইতেছে—

যদি বল, কার্য্য যে উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বেও ছিল—কোথায় ছিল?—ইহার উত্তর এই যে, তাহা কারণ দ্রব্যে লুক্কায়িত ছিল। ইহাতে যুক্তি কি? – অভিনব উৎপত্তিপক্ষে বিপ্রতিপত্তিই বা কি?—

অভিনব উৎপত্তি পক্ষে বিপ্রতিপত্তি [ব্যাঘাত] এই যে প্রথমতঃ সিদ্ধ সাধন অর্থাৎ যাহা থাকে, তাহার আবার উৎপত্তি কি?—"ছিল না হইল" এমন হইলেই উৎপত্তি বলা যায়। কার্য্য যদি চিরকালই আছে. তবে তাহার নিমিত্ত যত্ন বা আয়াস কেন?—

আছে। আয়াস বা যত্নের প্রয়োজন আছে। লুকায়িত অর্থাৎ শক্তিরূপে অবস্থিত অব্যক্ত-কার্য্যকে ব্যক্ত করাই যত্ন ও আয়াসের ফল; কেননা, অনভিব্যক্ত কার্য্য সকল ব্যবহারের অনুপযোগী এবং নিষ্ফল। মৃৎপিণ্ডে ঘট-শক্তি আছে কিন্তু ঘটের অভিব্যক্তি-ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা জলাহরণ বা অন্যবিধ অর্থ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না; সুতরাং অভিব্যক্তির নিমিত্ত তাহাতে ব্যাপার-সংযোগ করিতে হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সদ্ভাব থাকিলেও যখন তাহার অভিব্যক্তি হওয়ার অপেক্ষা আছে, তখন আর কার্য্য-প্রবৃত্তির ব্যাঘাত জন্মিবে কেন? যত্ন বা আয়াসের বৈকল্যই বা হইবে কেন?—কার্য্যেব অনাগতাবস্থা বা কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বাবস্থা অথবা অব্যক্ত-অব[illegible] অনুৎপত্তি। আর, বর্ত্তমানাবস্থা বা ব্যক্ত-অবস্থাব নাম উ[illegible] অতীতাবস্থা বা স্বকারণে পুনর্ব্বিলীন হওয়ার নাম ধ্বংস [illegible] অন্যবিধ উৎপত্তি ও বিনাশ এ জগতে নাই।

যে কারণ-দ্রব্যে যে কার্য্য-শক্তির অভাব আছে, সেই কারণ-দ্রব্য হইতে সেই কার্য্যের উৎপত্তি কদাচ হইবে না। শত সহস্র শিল্পী একত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে পারিবেন না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া চির কাল নিষ্পীড়ন করিলেও বালুকা হইতে স্নেহ নির্গলিত হইবে না; কেন না, পীত বা স্নেহ, নীলে বা বালুকাতে নাই। অতএব যে কার্য্য যে উপাদানে লুকায়িত থাকে, শক্তি রূপে নিহিত থাকে, সেই কার্য্যই সেই উপাদান হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, কার্য্যান্তর হয় না। যদি তাহা হইত, তবে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু হইতে পারিত। যখন তাহা হয় না, তখন বিশেষ বিশেষ কার্য্য-শক্তি বিশেষ বিশেষ উপাদানে শক্ত [শক্তি রূপে লুকায়িত

আছে, সন্দেহ নাই। কপিল এই সৎকার্য্য রক্ষার নিমিত্ত অনেক প্রকার তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল পরিত্যাগ করা গেল *।

সাংখ্য মতে কার্য্য দ্বিবিধ। এক অভিব্যজ্যমান; অপর উৎপদ্যমান। ধান্য হইতে তণ্ডুল, গো হইতে দুগ্ধ,—ইত্যাদি প্রকার কার্য্য জাতের নাম অভিব্যজ্যমান। বীজ হইতে অঙ্কুর, আহার-দ্রব্য হইতে শোণিত, ইত্যাদি জাতীয় কার্য্যের নাম উৎপদ্যমান। এই দ্বিবিধ কার্য্যই শক্তিরূপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ করিলেই তাহারা স্বীয় স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশ পাওয়ার নাম কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও [illegible]

[illegible] ক্তির জ্ঞান কাহারো বা কার্য্য-নিষ্পত্তির অনন্তর জন্মে, [illegible] তৎপূর্ব্বেই জন্মে। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরা" পরে জন্মে

---

* "ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ" "নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" "উপাদান নিয়মাৎ" "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ" "শক্তস্য শক্য করণাৎ" "কারণ ভাবাচ্চ" "নাভি ব্যক্তি নিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ" "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই সকল কাপিল সূত্রের মর্ম্ম লইয়া ইহা লিখিত হইল। ভাব এই যে মৃত্তিকায় যদি ঘটশক্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ মৃত্তিকা দ্বারা লোকে ঘট প্রস্তুত করিতে পারিত না। মৃত্তিকার ঘট জন্মাইবার শক্তি আছে বলিয়াই মৃত্তিকা ঘট জন্মায়। মৃত্তিকা ঘট জন্মাতে পারে বলিয়াই লোকে মৃত্তিকা মধ্যে ঘট আছে জানে এবং তন্নিমিত্তই লোকে তন্মধ্য হইতে ঘট বাহির করিবার চেষ্টা পায়। এইরূপ প্রকৃতিতে যদি জগৎ-রচনা শক্তি না থাকিত—তাহা হইলে কদাচ প্রকৃতি জগৎ রচনা করিতে পারিত না। প্রকৃতিতে জগৎ-উৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়াই প্রকৃতি জগৎ জন্মায়। ইত্যাদি। সাঙ্খ্য যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব লোপ করিবেন, এই স্থান হইতেই তাহার সূত্রপাত।

জড় বুদ্ধি মনুষ্যের, আর পূর্ব্বে জন্মে পরীক্ষক মনুষ্যের। এই জন্যই পরীক্ষক পুরুষেরা কার্য্যোন্নতি করিতে পারেন, জড় বুদ্ধিরা পারেন না।

সাংখ্য মতে কারণও দুই প্রকার। এক প্রকারের নাম নিমিত্ত কারণ, অন্য প্রকারের নাম উপাদান কারণ।* কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে "যেন বিনা যন্ন ভবতি তস্য কারণম্" অর্থাৎ যদ্ব্যতিরেকে যে আত্ম-লাভ করিতে পারে না, সে তাহার কারণ। এই লক্ষণ অনুসারে সকল বস্তুই সকল বস্তুর কারণ হইয়া উঠে,—এই জন্য সাধারণ কারণ কূটের মধ্য হইতে কতক গুলিকে কর্ত্তা, কতকগুলিকে কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ, সম্প্রদান প্রভৃতি নাম দিয়া বিশেষ করা হয়। পশ্চাৎ অবশিষ্ট দুইটির মধ্যে ঘনিষ্টতা অনুসারে একের নাম নিমিত্ত কারণ—অপরের নাম উপাদন কারণ বলা হয়। এই উপাদা[illegible] নৈয়ায়িকেরা সমবায়ী কারণ বলিয়া থাকেন। উপাদা[illegible] সহিত নিমিত্ত-কারণের প্রভেদ এই যে, জায়মান কার্য্যের শরী[illegible] দান-কারণ-দ্রব্যটী-সংযুক্ত থাকে, নিমিত্ত কারণটি সেরূপ থা[illegible] না। ঘটরূপ কার্য্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং নিমিত্ত কারণ দণ্ড, চক্র,

---

* কারণ-জ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া সুকঠিন। কোন কার্য্য উৎপন্ন হইলে পর তাহার কারণ অবধারণ করা বরং সহজ, কিন্তু ভবিষ্যৎ কার্য্যের কারণ অবধারণ করা বড় কঠিন। তাহা সুনিপুণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন-ব্যক্তিরাই পারেন—যুক্তি-কুশল ধ্যান-পারগ-ব্যক্তিরাও পারেন।

কার্য্যের কারণ নির্ণয় কালে অন্বয় ও ব্যতিরেক, উভয় পথই অবলম্বন করিতে হয়। কোনটি থাকাতে কার্য্যটি জন্মিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে এবং কোনটি না থাকিলে তাহা হইত না ইহাও দেখিতে হইবে, "যাহা না থাকিলে হইত না" এই অংশটি নিকট সম্বন্ধ অনুসারে গ্রহণ করিতে হইবে; নচেৎ কুম্ভকারের পিতামহ না থাকিলে ঘট হইত না বলিয়া যে ঘটের প্রতি সেই পিতামহও কারণ হইবে, এমত নহে।

সলিল ও সূত্র প্রভৃতি। বলয়াদি কার্য্যের উপাদান সুবর্ণ, এবং তাহার নিমিত্ত কারণ [illegible]দংশ ও ভস্ত্রা [জাঁতা] প্রভৃতি। ঘটরূপ কার্য্যের শরীরে মৃত্তিকারূপ উপাদান সংলগ্ন থাকিবে কিন্তু নিমিত্ত-কারণের সংস্রবও থাকিবে না; কেন না, নিমিত্ত কারণ, কার্য্য জন্মাইয়া দিয়াই কৃতার্থ হয় সুতরাং তাহার সহিত আর কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে না। ফল, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য-জন্মে, বা, যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, তাহারই নাম উপাদান। কারণে যে কার্য্য শক্তি বিলীন হইয়া থাকে, সে উপাদান কারণেই থাকে, নিমিত্ত কারণে নহে।

সাংখ্যমতে বর্ত্তমান সমস্ত জগতের উপাদান প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি[illegible] অনন্ত ও অপ্রমেয় কার্য্যজনন-শক্তি লুক্কায়িত ছিল, ক্রমশঃ তা[illegible]ব্যক্ত হইয়া এই দৃশ্যমান বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্র[illegible] কি প্রকারে তাহা হইতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে? [illegible] কাণ্ডে বিবৃত হইবে। সুতরাং এই স্থানেই পরীক্ষাকাণ্ড [illegible]গেল।

পরীক্ষাকাণ্ড সমাপ্ত।